দ্রব্যের প্রয়োজন হয় ইংলণ্ড মুক্তহস্তে তাহা যোগাইতেছেন, সুতরাং অভাববোধ জন্মিতেছে না। অভাববোধ না জন্মিলে ক্লেশ স্বীকারে ইচ্ছা হয় না। সুতরাং উন্নতিদ্বার আপনা আপনি রুদ্ধ হয়। আততায়ীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে শারীরিক ও তদানুষঙ্গিক মানসিক শক্তির প্রয়োজন। কেহ তোমার আত্মীয়ের প্রাণসংহার করিলে সর্ব্বাগ্রে কি উপায়ে তাহাকে পর্য্যুদস্ত করিবে এই চিন্তা তোমার অন্তঃকরণ আলোড়িত করিবে, এবং এই চিন্তা হইতে তোমার শারীরিক ও মানসিক শক্তিবর্দ্ধনের চেষ্টা হইবে। তখন তুমি ব্যায়ামাদি প্রক্রিয়াদ্বারা শারীরিক শক্তিবৃদ্ধি করিবে এবং উদ্ভাবনীশক্তির চালনাদ্বারা নূতন নূতন অস্ত্রশস্ত্রাদির নির্ম্মাণ করিবে। এই উপায়ে মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক শক্তির বৃদ্ধি হয়। কিন্তু যদি অপর কেহ তোমার আততায়িনিবারণের ভার গ্রহণ করে, তাহা হইলে আর তোমার শারীরিক ও মানসিক শক্তিচালনার প্রয়োজন হইবে না। তুমি করদ্রুতক্রীড়নকবৎ অপরকর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হইবে। তোমার অভাব ও আবশ্যকতাবোধ চলিয়া যাইবে, সুতরাং তোমার উন্নতিদ্বার প্রতিরুদ্ধ হইবে। ভারতবর্ষ সাতশত বৎসরযাবৎ এইরূপে বিদেশীয় শত্রুর হস্ত হইতে মুসলমান ও ইংরেজ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে, সুতরাং ভারতবাসিগণ শারীরিক ও অস্ত্রপরিচালনাশক্তির পরিচর্য্যা করিতেছেন না। তাহারা এবিষয়ে ক্রমান্বয়ে অধোগমন করিতেছেন। যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন হইত; তাহা হইলে এবিষয়ে ভারতবাসিগণের বুদ্ধিনৈপুণ্যের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হইত, কিন্তু পরাধীনতানিবন্ধন তাঁহারা এতদ্বিষয়ক বুদ্ধির পরিচালনাই করেন না। সুতরাং কামান, বন্দুক, গোলা, গুলি, ঢাল, তরবার প্রভৃতি দেখিলেই তাঁহাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, তাহারা উহাদিগের কৌশল ও প্রক্রিয়া অবগত হইতে অণুমাত্রও চেষ্টিত হয়েন না। তবে কি শারীরিক শক্তিবৃদ্ধি করিবার জন্য ভারতবাসীর স্বাধীন হইতে হইবে? এ কথার উত্তর, শক্তিবৃদ্ধি না হইলে লোক স্বাধীন হইতে পারে না। সুতরাং স্বাধীনতার অভাব ও আবশ্যকতাবোধ হইলেই ভারতবাসীর শারীরিক শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা হইবে, এবং অস্ত্রপরিচালননৈপুণ্য শিক্ষা করিতে অভিলাষ জন্মিবে। ভারতবাসিগণ এই অভাব অনুভব করিতেছেন, সুতরাং ব্যায়ামাদি শারীরিক শক্তিবৃদ্ধির প্রক্রিয়াসকল ভারতীয় শিক্ষাপ্রণালীর অন্তর্নিবিষ্ট করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই গেল শারীরিক শিক্ষা সম্বন্ধে। এক্ষণে মানসিক শিক্ষাসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিত বলিয়াই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

যে প্রণালীতে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান ভারতে শিক্ষাবিস্তার করিতেছেন, আমাদিগের বিবেচনায় তাহা ইদানীন্তন ভারতসন্তানগণের সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। ইংরেজ এদেশে আধিপত্যবিস্তার করিয়া দেখিতে পাইলেন, এদেশীয়দিগকে স্বল্পপরিমাণে ইংরেজিভাষায় শিক্ষিত না করিলে কেবল ইয়ুরোপীয় লোকদ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হওয়া সুকঠিন। সুতরাং, তাঁহারা এদেশীয়দিগকে কার্য্যপরিচালনোপযোগী ইংরেজিভাষায় শিক্ষিত করিবার মানসে সেই প্রণালী-অনুসারে ভারতে স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সকল স্কুল ও কলেজে যে সকল বিষয় অধ্যাপিত হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই ভারত-

বাসীর ভাবি উন্নতির প্রতিবোধক। ভারতবাসী তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াও বর্ত্তমান শিক্ষাবিভাগের নিয়ম অনুসারিয়া স্কুলকলেজে পড়িতেছেন, বি এ,এম এ পাস করিতেছেন। কিন্তু লাভ হইতেছে কি? তোতার মত কতকগুলি বিজাতীয় ভাষা উদ্গীরণের ক্ষমতা জন্মিয়াছে, আর টেবিলে বসিয়া হংসপুচ্ছধারী হইতেছেন। স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন মতপরিচালনের শক্তি নাই, অন্যদীয় ভাষা বমন করিয়া আপনাদিগকে পরমজ্ঞানী মনে করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করি, বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থাপনাবধি কয়জন লোক স্বকীয় বুদ্ধি অথবা মার্জ্জিত প্রতিভাবলে একটী নূতন কল অথবা নূতন কারখানার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন? তাহা হইবে না, হইতে পারে না। ইংরেজরাজ আমাদিগকে সে ভাবে শিক্ষা প্রদান করেন নাই। আমরা গুণী ও জ্ঞানী হইয়া জগতে প্রাধান্যলাভ করিব, আমরা বুদ্ধিকৌশলে জগতে অসাধারণব্যাপার সম্পাদন করিব, ইংরেজের ইহা ইচ্ছা নহে, এবং সেই হেতুই ইংরেজ আমাদিগকে সেই প্রণালীর শিক্ষা প্রদান করেন নাই। ইংরেজগবর্ণমেণ্ট চাহেন, আমরা সামান্য সামান্য রাজকার্য্যে তাঁহাদিগের সাহায্য করি, চিনির বলদের মত বোঝা লইয়া যাই আর আসি। তাহা যদি না হইবে, তবে ইংরেজ আমাদিগকে সামান্য কেরাণিজাতিতে পরিবর্ত্তিত করিবেন কেন? ইংরেজ জেতা, আমরা জিত, সুতরাং ইংরেজের প্রাধান্য চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিতেই হইবে! কোথায় দেখিয়াছ, প্রবল দুর্ব্বলের হস্তে অত্যুচ্চ ক্ষমতা প্রদান করিয়া তাহাকে আপনার সমকক্ষ করিয়া লইয়াছে? জগতে এরূপ উদাহরণ অতি বিরল। তাই বলি আমাদের উন্নতি, ইংরেজের চক্ষুঃশূল। আমরা ইংরেজের নিকট সেরূপ শিক্ষাপ্রণালী প্রত্যাশা করিতে পারি না। আমাদের উন্নতি আমাদের স্বয়ং সাধিতে হইবে।

আজি কালি শুনিতে পাওয়া যায় "অমুক ইংরেজীতে অতি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিতে পারেন, অমুক অতি উৎকৃষ্ট ইংরেজী লিখিতে পারেন।" তাহাতে লাভ কি? অপরের ভাষা উৎকৃষ্টরূপে বলিতে ও লিখিতে পারাই যদি জ্ঞানের লক্ষণ হয়, তবে সে জ্ঞান থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান। একজন সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরেজী, পার্শী আরবী হিন্দী, উর্দ্দু প্রভৃতি ১০।১২ ভাষা লিখিতে অথবা বলিতে পারে, কিন্তু তথাপি সে পণ্ডিত না হইতে পারে। আর একজন কেবলমাত্র সংস্কৃত অথবা ইংরেজী অধ্যয়ন করিয়াও পণ্ডিতাগ্রগণ্য বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারে। শুদ্ধ ভাষাশিক্ষা—জ্ঞানশিক্ষা নহে। ভাষা, জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। আমাদের সমাজে এখন ভাষাশিক্ষাকেই জ্ঞানশিক্ষা বলিয়া বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা জ্ঞান কাহাকে বলে, তাহাই বুঝিতে পারি না। প্রকৃতির নানাবিধ প্রচ্ছন্ন সত্য জ্ঞাত হওয়ার নাম জ্ঞানলাভ। সর্ আইজাক্ নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনি জগতের একটী প্রধান বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। বাষ্পীয়যন্ত্রের উদ্ভাবক ওয়াট্‌সাহেব বাষ্পের প্রকৃতি আবিষ্কার করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাকেও জ্ঞানী বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রফেসার আবসালম্ দশভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন, তথাচ সভ্যজগৎ তাঁহাকে প্রকৃত জ্ঞানী বলিবে না। আমাদের দেশে বি এ এম্ এ পাস করিলে এবং কতকগুলি ইংরেজী

বকিতে পারিলেই সে জ্ঞানী হইল। ইহা দেশের পরম দুর্ভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। যিনি তাড়িতের পরিচালনশক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহাকে জ্ঞানী বলিব? না যিনি কতকগুলি নির্দ্ধারিত গ্রন্থের সূত্র মুখস্থ করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাকে জ্ঞানী বলিব? সমগ্র সভ্যজগৎ অবশ্যই বলিবে, যিনি প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন সত্য জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। আমাদিগের দেশে এইরূপ জ্ঞানী কয়জন আছেন? অবশ্য প্রাচীন ভারতের কথা এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে না। আধুনিক ভারতবাসিগণমধ্যে কয়জন স্বীয় অসামান্য বুদ্ধি অথবা প্রতিভাবলে একটী নূতনযন্ত্র অথবা নূতন কৌশলের উদ্ভাবন করিয়াছেন? আমরা নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে বলিতেছি যে, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর বিষময় দোষে আমাদিগের বুদ্ধি ক্রমশঃ জড় হইয়া যাইতেছে। আমরা কেরাণিগিরিকেই জীবনের প্রধান কাজ বলিয়া ভাবিয়াছি; সুতরাং জগতের কোন উৎকৃষ্ট কার্য্যেই লাগিতেছি না। মনে রাখিবেন, কেরাণিগিরি অর্থে আমরা কেবল নিরীহ কেরাণিসম্প্রদায়কেই লক্ষ্য করিতেছি না; ভারতীয় চাকুরীপ্রিয় মহাত্মামাত্রেই আমাদের লক্ষ্য। তাঁহারা কোনরূপে বি এ, এম্ এ পাস করিয়া একটা চাকরী গ্রহণ করিবেন এবং স্ত্রীপুত্রপরিবার লইয়া কোনরূপে সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, ইহাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। হা দুর্ভাগ্য! যে দেশের এরূপ শোচনীয় মানসিক বিকৃতি ঘটিয়াছে, কতদিনে তাহার পুনরুন্নতি সংসাধিত হইবে? যে ভাবে সংসারে আসিয়াছি, ভালয় ভালয় কোনরূপে খাইয়া পরিয়া সেইভাবে জীবনটা কাটাইয়া যাওয়াই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হইল, তবে এমন জীবন যে দিন আসিয়াছিল, সেইদিন যাওয়াই ভাল ছিল। তাহা নয়। ভারতবাসি! চক্ষু উন্মীলিত কর। জগতের দিকে লক্ষ্য কর। দেখ, সুদূরবর্ত্তী আমেরিকা, জর্ম্মনি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড কোথায় উঠিয়াছে! নানাবিধ কলকৌশলের উদ্ভাবন করিয়া তাহারা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যবংশীয়গণের কতদূর কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছে। তোমরা কি তাহাদের কণামাত্র শক্তিলাভ করিতেও সমর্থ হইবেনা? পরের দৃষ্টান্ত দেখিয়া কি অনুকরণলালসাও বলবতী হইবে না? শুদ্ধ খাওয়া দাওয়ার জন্য তোমরা সংসারে আইস নাই। খাওয়া দাওয়া পশুতেও করে। তোমাদের জীবনের মহত্তর লক্ষ্য আছে। যাহাতে সেই উদ্দেশ্যসংসাধন করিয়া জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিতে পার, সেই চেষ্টা কর। একদিনে না হইতে পারে, দুইদিনে না হইতে পারে, কিন্তু সমবেতশক্তিবলে একদিন না একদিন অবশ্যই তোমাদের উন্নতি সাধিত হইবে। এককালে তোমরা মহৎ ছিলে, অবশ্যই আবার এককালে জগতে সেইরূপ মহৎ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে। এখনও সময় আছে, চেষ্টা কর। মানসিকবলে গরীয়ান হইয়া জগতের প্রধান জাতিমধ্যে আসন পরিগ্রহ কর।

কেহ মনে করিবেন না, আমরা ইংরেজি-শিক্ষার বিরোধী। বরং আমাদের ভাষা যেরূপ অপূর্ণ এবং আমরা বহুদিন পরপদানত থাকায় ইহা যেরূপ লাঞ্ছিত ও অবহেলিত, তাহাতে ইংরেজিভাষা শিক্ষা করিয়া ইহার সম্যক পুষ্টিসাধন করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য ইতিহাস ও পাশ্চাত্য ন্যায় আয়ত্ত করিতে হইলে আমাদিগের ইংরেজিশিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। আমরা ইংরেজীকে আর অধিক দখল দিতে চাহি না। ইংরেজী আমাদের লেখ্য অথবা কথ্য ভাষা হইবে, আমরা স্বপ্নেও এমন মনে করি না। ২৫ কোটী লোক একবারে মাতৃভাষা ভুলিয়া গিয়া ইংরেজি বোল উচ্চারণ করিবে, ইহা অনুমান করাও অসম্ভব। যাহা হউক, আমাদিগের মাতৃভাষার পুষ্টিসাধনকরণার্থ ইংরেজিশিক্ষার আবশ্যক। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্ষণ যে উপায়ে ইংরেজিশিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে, আমরা তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। তথায় ভাষাশিক্ষাই প্রধান বলিয়া গণনীয় হইয়া থাকে। বি এ, এম্ এ প্রভৃতি পরীক্ষায় বিজ্ঞানের যে সামান্য মূলসূত্রগুলি অধ্যাপিত হইয়া থাকে, তাহার অধ্যাপনা করা না করা সমান। কারণ এ পর্য্যন্ত একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীও এইরূপ যৎসামান্য ব্যুৎপত্তিদ্বারা বিজ্ঞানের কার্য্যকারিতা প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। সুতরাং এইরূপ সামান্য সামান্য মূলসূত্র না পড়াইয়া বিজ্ঞানের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্কুল ও কলেজ সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। এই সকল কলেজে শিক্ষিত হইয়া বিজ্ঞানশাস্ত্রপারদর্শী যুবকগণ এতদ্দেশে বিজ্ঞানের প্রচার আরম্ভ করিবেন। এ বিষয়ে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সরকারমহাশয়ের বিজ্ঞানসভায়ও ইংরেজীতে বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়া থাকে। আমাদিগের বিবেচনায় বিজ্ঞানশাস্ত্রের নূতন নূতন সমস্তত্ত্ব দেশীয়ভাষায় অনুবাদ করিয়া দেশীয়দিগকে স্বদেশীয় ভাষায় বুঝাইয়া দিলে তাঁহারা অল্পসময়ে বিজ্ঞানের অধিকাংশ বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিবেন। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, বঙ্গদেশ, ভারতের সর্ব্বোন্নত স্থান হইয়াও, স্বদেশীয় ভাষায় স্কুলকলেজসংস্থাপন করিতে সমর্থ হইল না। অথচ পঞ্জাববাসিগণ অল্পকালমধ্যেই এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া উঠিলেন। বঙ্গবাসী নিতান্ত বাবদূক ও আড়ম্বরপ্রিয়। কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদিগের তাদৃশ উৎসাহশীলতা নাই। এ বিষয়ে আমাদিগের পঞ্জাববাসী ভ্রাতৃবৃন্দের অনুকরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। স্বদেশীয় ভাষায় বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের উপদেশ প্রদত্ত হইলে নানা উপকারের সম্ভাবনা। প্রথমতঃ সেই শাস্ত্রগুলি দেশীয়ভাষায় আনীত হয়, তদ্দ্বারা ভাষার পুষ্টি সাধিত হয়। দ্বিতীয়তঃ উহাতে দেশীয়গণ সহজে ও স্বল্পায়াসে ঐ সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। পরকীয় ভাষা আয়ত্ত করিতে যে সময় অতিবাহিত হইবে, সে সময়ে তাঁহারা অনায়াসে বিজ্ঞানের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিতে পারিবেন। আমরা এই হেতু প্রস্তাব করি, দেশীয়গণ উদ্যোগী হইয়া শীঘ্র শীঘ্র স্বদেশীয় ভাষায় স্কুল কলেজ সংস্থাপন করিতে প্রস্তুত হউন এবং যাবতীয় ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্র মাতৃভাষায় অনুবাদ করুন।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, ইংরাজেরা আমাদিগকে কার্য্যকরী বিজ্ঞান অতি অল্পই শিক্ষা দিতেছেন। যে সকল ব্যবসায় অবলম্বন করিলে আমরা পরের দাসত্ব না করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিব, —যে সকল ব্যবসায়ে আমরা জগতের উন্নত জাতিসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিব, ইংরেজ আমাদিগকে তাহা শিখান নাই। যদিও শিবপুরে একটী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথাপি তাহাতে সমাক-

রূপ কার্য্যকরী বিজ্ঞান শিখিবার উপায় প্রদর্শিত হয় নাই, এবং উক্ত স্কুল হইতে বহির্গত হইয়া কোন ছাত্রই ইংরেজগবর্ণমেণ্টের প্রসাদ প্রত্যাশী না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। সুতরাং আমাদিগকে বাধ্য হইয়া স্থানে স্থানে কার্য্যকরী বিজ্ঞান শিখিবার জন্য স্কুলসংস্থাপন ও তদানুষঙ্গিক যন্ত্রাদি আহরণ করিতে হইবে। এই সমস্ত মহদুদ্দেশ্য সংসাধন করিতে হইলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু তৃণবল বালুকণা একত্রিত হইলে বলবতী তরঙ্গিনীরও স্রোত রুদ্ধ করিতে পারে সমবেত যত্নে কি না হয়? ভারতবাসি, একবার উদ্বোধিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ কর, দেখিবে কিছুরই অভাব হইবেনা। অচিরে মহদভিলাষ পূর্ণ হইবে। যে সামান্য বস্ত্র, দেশলাই আল্‌পিন, ছুরী, কাঁটা প্রভৃতির জন্য তোমরা ম্যাঞ্চেষ্টার, বার্ম্মিংহামের মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছ অচিরে সে অভাব বিদূরিত হইবে। কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হইলে অর্থ আপনিই আসিবে। জ্ঞানলাভই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। একবার কিঞ্চিৎ জ্ঞান আয়ত্ত হইলে সহজেই অর্থোপার্জ্জনের পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিবে। তখন আর অন্যদীয় সুপারিষ প্রয়োজন হইবে না। লোকে তোমার গুণবত্তা দেখিয়াই তোমার দ্রব্য গ্রহণ করিবে। নূতন নূতন কল কারখানা সংস্থাপন করিয়া যখন তুমি দেশীয় ভাষায় সকলকে উহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতে পারিবে এবং যখন সকলেই অল্প বা অধিকপরিমাণে উহার অভাব ও আবশ্যকতা অনুভব করিয়া তোমার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে যোগদান করিবে, তখন দেখিবে জগতে তোমার নাম ধন্য হইবে। জগতের লোক, জ্ঞানপিপাসু, কর্ম্মপিপাসু হইয়া, তোমার নিকট আগমন করিবে।

আমাদিগের এক্ষণ এইরূপ শিক্ষারই প্রয়োজন। ভারতবর্ষে শিল্প ও বিজ্ঞানের সম্যক উন্নতিসাধনই অবশ্যক এবং আমরা দিন দিন ইহারই অভাব ও আবশ্যকতা অনুভব করিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী করা যত না গৌরবের বিষয়, একটী সামান্য বস্ত্র বয়নযন্ত্র নির্ম্মাণপূর্ব্বক দেশীয়দিগকে ম্যাঞ্চেষ্টারনির্ভরতা হইতে রক্ষা করা ততোধিক গৌরবের বিষয়। এবং এই হেতুই আমাদিগের সকলের সম্মিলিত হইয়া ভারতের স্থানে স্থানে কলকারখানা-সংস্থাপন ও তদ্বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য। দেশীয় ভাষায় যাবতীয় শিল্পবিজ্ঞানের মর্ম্ম দেশীয়গণকে বুঝাইয়া দেওয়াই ভারতীয় শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, এবং এই হতভাগ্য দেশে এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী অনুসৃত হওয়াই একান্ত আবশ্যক। যদি আমরা এইরূপ শিক্ষা প্রণালীর বিরোধী হই, জানিব আমরা নিতান্ত অপদার্থ —'ভারতবাসী' নামের কলঙ্ক।

শ্রীরাজবিহারী দাস।

সার-সংগ্রহ।

মাসিকপত্র।

নব্যভারত—চৈত্র, ১২৯০ ও বৈশাখ ১২৯১। ১ম খণ্ড; ১১শ ও ১২শ সংখ্যা।

বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সাময়িক পত্রিকাগুলির অবসাদসময়ে নব্যভারত বাহির হইতে আরম্ভ হয় এবং এই একবৎসর কাল নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। গত বর্ষে অনেকগুলি সুশিক্ষিত ব্যক্তি ইহার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নবান ছিলেন।

১১শ ও ১২শ সংখ্যার বিষয়ঃ—

১। একতা। (শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়)।

২। বাল্মীকি ও বেদব্যাস। (শ্রীগোপীচন্দ্র সেন গুপ্ত)।

৩। লোকসংখ্যা। (শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়)।

৪। সামাজিক শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। (শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়)।

৫। শাক্যচরিত, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধদর্শন। (শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্, এ)।

৬। বিকাশ। (শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়)।

৭। আকাঙ্ক্ষা—পদ্য। (শ্রীচন্দ্রকান্ত সেন এম্ এ, বি, এল)।

৮। নবলীলা। (শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী)।

৯। উৎসব সঙ্গীত—পদ্য।

১০। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা। (শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস)।

১১। অনন্তমিলনের রাজ্যে। (শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী

১২। ভারতে ইংরাজ রাজত্ব।

১। একতা। লেখকের মতে সমস্ত জগৎ মূলে এক হইলেও প্রাকৃতিক নিয়মে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। মনুষ্যজাতিতেও এই সাম্প্রদায়িকতা আছে। ধর্ম্ম, সকল সম্প্রদায়কে ভাঙ্গিয়া এক করিতে পারিলেও তদ্দ্বারা সাম্প্রদায়িকতা দূরীভূত হয় নাই—এক হৃদয়ই সকল মনুষ্যকে একতাসূত্রে গ্রথিত করিতে সক্ষম। হৃদয়ের দ্বারা আপন স্বার্থকে পরের স্বার্থের সহিত সম্মিলিত করিলে নিরবচ্ছিন্ন হিতসাধন হইতে পারে—উদারতা ও সাম্য ব্যতীত একতাও অসম্ভব। কিন্তু ইহাও ধর্ম্মের প্রশস্ততা ভিন্ন আর কিছুই নহে, তবে গোঁড়ামীর দ্বারা ইহার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে—"ধর্ম্মই আবার এক সময়ে পৃথিবীতে একতা সাধনের, সাম্য বিধানের এবং স্বার্থের সম্মিলন সংঘটনের এক মাত্র উপায় হইয়া উঠিবে"। এক্ষণে একতা অবলম্বন করিয়া আমাদিগের সমাজকে দৃঢ় করিবার উপায় কি? রাজনৈতিক একতা এক্ষণে সম্ভাবিত নহে। লেখক বলেন, "একতার সাধারণ উদ্দেশ্য ধর্ম্ম হইলে চলিবে না, কেন না এখন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা যে সত্বর আবার একতাকারে পরিণত হইবে, এমত বোধ হয় না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে এখন মুসলমানের সংখ্যাও বড় কম নহে। তাহাদিগের সঙ্গেও আমাদিগের সময়ে সময়ে স্বার্থের মিলন করিতে

হইবে। আমরা হিন্দুত্ব ছাড়িতে পারিব না, কেন না হিন্দু এখনও ভারতের প্রধান ও বহুসংখ্যক অধিবাসী। একতার বল উৎপাদন করিতে হইলে সংখ্যার বলও উপেক্ষিত হইবার বিষয় নহে। অধিকন্তু হিন্দু আমাদের প্রাচীন নাম অভ্যাস বশতঃই অধিকাংশ লোকে এই নামই ভালবাসে। অতএব হিন্দুত্বের যাহা কিছু সার আছে, তাহাই সংগ্রহ করিয়া সমাজ দৃঢ়ীভূত করাই আমাদের সাধারণ লক্ষ্য হউক। এই লক্ষ্য অবলম্বন করিয়া সমাজসংস্কারে যত্নবান হইলে দেখা যাইবে অচিরেই আমাদের একতার লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। সামাজিক এক একটী বিষয় লইয়া সকলেই আন্দোলন করুন, অবশ্যই আন্দোলনের ফল আছে সন্দেহ নাই। হিন্দুত্ব বজায় হইতেছে, ইহার লক্ষণ দেখিলেই হিন্দুসমাজ আবার স্থির হইয়া উঠিবে। তবে হিন্দুত্বের যে গুলি দোষ আছে, তাহা একে একে দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এককালীন সকল দোষ কখনই দূর হইতে পারে না। কিন্তু দোষের আধিক্য দেখিয়াও ঘৃণা করিলে চলিবে না।"

৩। লোকসংখ্যা। এই সংখ্যায় প্রস্তাব শেষ হইয়াছে। লেখক লোকাধিক্যজনিত অনিষ্টনিবারণের দ্বিবিধ উপায়ের আলোচনা করিয়াছেন। প্রথম, যাহারা জন্মিয়াছে তাহাদিগের সুখস্বচ্ছন্দতার উপায়। দ্বিতীয়, যাহাতে অধিকসংখ্যক লোক না জন্মিতে পারে তাহার উপায়। এ অধ্যায়ে ইহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমাদিগের বিবেচনায় প্রবন্ধটী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে সাধারণের উপকারে আসিতে পারে।

৬। বিকাশ। লেখক 'বিকাশ' বা Evolutionএর এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—পরিদৃশ্যমান জগদ্বিকাশের মূলযন্ত্র গতি। গতি আবার শক্তির বিকাশ। অতএব শক্তিই মূলাধার—জড়ের সংস্কার ভ্রান্তিমূলক। জড়ের শেষ সীমা ইথার আর "পরমাণু, বস্তুর অনুমানিক সূক্ষ্মতম সীমামাত্র, ইথারের অপেক্ষা সূক্ষ্মবস্তু কল্পনা করিতে পারিলেও তাহার পশ্চাতে শক্তি আছে। শক্তি গাঢ় হইলেই বিকাশ আরম্ভ হয়। এই শক্তি কি? শক্তি, ইচ্ছা—ঘনীভূত ইচ্ছার প্রবাহ। সেই ইচ্ছা নিয়মিত ও শাসিত। ইচ্ছার শাসন আছে বলিয়াই সংসার বৈচিত্রময়। উচ্ছৃঙ্খল, নিরঙ্কুশ ইচ্ছার কার্য্য মহাপ্রলয়। এই মহতী ইচ্ছার শাসক কে? উদ্দেশ্য। অভিপ্রায় ব্যতীত ইচ্ছার উদ্রেক হয় না। "গূঢ় অভিপ্রায়ের আদেশেই ইচ্ছা, বিশ্বকর্ম্মা হইয়া বিবিধ বিচিত্র শোভাধার বস্তু দ্বারা, এ ব্রহ্মাণ্ডদেহ সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে" লেখক বলেন, এক দল পণ্ডিত এই অভিপ্রায়কে উড়াইয়া দিয়া তিনটী প্রাকৃতিক নিয়ম (Natural Selection Survival of the Fittest এবং Sexusal Selection) অবলম্বন করিয়া সৃষ্টিকে ঘটনাসম্মিলিত পদার্থ-স্তূপমাত্র প্রমাণ করিতে চাহেন। লেখক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এমত ভ্রান্ত এবং সকলের আদিতে অভিপ্রায় বিদ্যমান আছে। উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় কি পদার্থ? উদ্দেশ্য, চিন্তার ফল। চিন্তা, আবার চেতনা ও ভাবুকতার ফল। চেতনা এবং ভাবুকতা দুই খানি ডাল, প্রেম কল্পতরু। প্রেমেই চিৎশক্তির চিরনিবাস। লেখকের মতে এই বিশ্ববিকাশ প্রেম বা আনন্দেরই মহাবিকাশ। প্রবন্ধটীতে বেশ চিন্তাশীলতা আছে।

আর্য্যদর্শন—ফাল্গুন, ১২৯০। ৯ম খণ্ড—৭ম সংখ্যা।

১। দেবদানবীয়ং—মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা। হাস্যরসোদ্দীপক এক অসম্পূর্ণ মহাকাব্যের প্রথম সর্গের ৮ পংক্তি।

২। তত্ত্ববিদ্যায় নাস্তিকতা (শ্রীপ্রসন্ন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)।—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। লেখক বলেন হিন্দু-নাস্তিকতায় চার্ব্বাকদর্শন, বৃহস্পতিসূত্র ও রামায়ণস্থ জাবালির উক্তি দৃষ্ট হয়। ইঁহাদিগের মতে বেদ কিছুই নহে, স্বর্গ কল্পনামাত্র এবং পরলোক ও পরলোকগামী আত্মা নাই,—জগদ্বৈচিত্র আকস্মিক এবং স্বভাব হইতে উৎপন্ন অতএব সুখই একমাত্র পুরুষার্থ। পরন্তু এপিকুরসের কতকগুলি সারতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া লেখক দেখাইয়াছেন যে, পরলোকের ভয়ের নিরাকরণ করিয়া ইহলোকে সুখলাভই পরম পুরুষার্থ। এপিকুরসের মতে এই অনন্ত বিশ্ব পরমাণু সহযোগে নির্ম্মিত—পরমাণুর সংযোগ বিয়োগেই রূপ-বৈচিত্র; যাহা চৈতন্য ও জ্ঞান তাহা শরীরস্থ সূক্ষ্ম পরমাণুর সূক্ষ্ম সমাবেশ হইতে উৎপন্ন এবং দেহের সহিত আত্মা ও চৈতন্য ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। অতএব স্বর্গ ও নরকাদিভয় (ইঁহার মতে) মানবের মনের কাল্পনিকভাব-মাত্র। ঐ ভাব অর্থাৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া যাহাতে সুখলাভ করা যায় তাহাই কর্ত্তব্য। এই সুখোপার্জ্জনের উপায় স্থির করিতে ইনি হিন্দু-নাস্তিকতা-বিরোধী অনেক মতের পোষকতা করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহার শিষ্যেরা ক্রমে যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছেন। লেখক বলেন, গ্রীসে আস্তিকতা বদ্ধমূল হয় নাই বলিয়া নাস্তিকতা বিস্তর স্থান পাইয়াছিল এবং হিন্দুসমাজ ঘোর আস্তিকতাময় বলিয়া তথায় নাস্তিকতা বড় একটা স্থান পায় নাই,—বুদ্ধশিষ্য নাস্তিকতা নহে। লেখকের মতে, ভারতবর্ষে আস্তিক-তার আধিক্য ও গভীরতা প্রযুক্তই নাস্তিক-তায় প্রখরতা জন্মিয়াছিল।

৩। অপবর্গ (শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম)। হিন্দুগণ যে মুক্তিকে অপবর্গ বলেন তাহা চতুর্ব্বিধ—সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য, এবং সালিপ্য। শেষ মুক্তি, জ্ঞান বৈরাগ্য সাপেক্ষ হেতু আর সকল হইতে শ্রেষ্ঠ। পরমহংস যোগীরাই ইহা লাভ করিতে পারেন; অন্য যোগিগণ স্বর্গভোগান্তে আবার কর্ম্মানুসারে সংসারযাতনা ভোগ করেন। জীবন্মুক্ত ও বিদেহমুক্ত এই দুই প্রকার পরমহংসের মধ্যে জীবন্মুক্তেরা কখন কখন সংসারে আসেন; কিন্তু বিদেহমুক্তগণ তাঁহাদের দেহাবসানে পরমাত্মায় মিলিত হইয়া যান এবং সপ্তম স্বর্গ আধ্যাত্মিক জগতে গিয়া বিশ্রাম করেন। ইহাকে পৌরাণিকেরা সত্যলোক বলেন। এবং ইহাকেই যোগীরা আত্মসাক্ষাৎকার বলিয়া জ্ঞান করেন। এখানে বিশুদ্ধজ্ঞান আর পরমানন্দ ও সত্য ভিন্ন আর কিছুই নাই। জীবাত্মা যাবৎ ক্রিয়াশূন্য না হন তাবৎ অপর ছয়লোকে ভ্রমণ করিতে থাকেন। বিনা যোগে ও বিনা জ্ঞানে কর্ম্ম ও কর্ম্মবীজ কর্ম্ম ও কর্ম্মবীজধ্বংস হয় না, কেবল বিশুদ্ধ ভক্তিযোগে কর্ম্ম ও কর্ম্মবীজ ধ্বংস হইতে পারে। কোন কোন তন্ত্রে আরও পাঁচটী মধ্যবর্ত্তী লোকের উল্লেখ আছে।

আমার জীবনের ইতিহাস—উপন্যাস। (শ্রী শ্যাম—)।

আয়ুর্ব্বেদ ও বঙ্গানুবাদ—সমালোচনা।

(কবিরাজ শ্রীচন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত)। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্নমহাশয় চরকসংহিতার যে অনুবাদ করিয়াছেন সমালোচক তাহার কয়েকটী দোষ দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছে যে অনুবাদ শুদ্ধ হয় নাই।

ইন্দুমতী। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মায়াকানন নাটকের নায়িকা ইন্দুমতীর চরিত্র সমালোচনা করিয়া মৃত কবিবরের সন্তানদিগের সাহায্যার্থে প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে একখানি করিয়া মায়াকানন ক্রয় করিতে বলিয়াছেন। আমাদিগেরও বিবেচনায় স্বর্গীয় কবির সন্তানগণকে সাহায্য করা সাহিত্য ও স্বদেশপ্রিয় প্রতিবঙ্গসন্তানেরই কর্ত্তব্য। তবে মায়াকানন ক্রয় করিয়াই যে সাহায্য করিতে হইবে, এমন নহে।

সমর-শেখর—উপন্যাস।

আমার প্রাণ—পদ্য। (শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়)।

ভারতীয় যুদ্ধরহস্য। (শ্রীরামদাস সেন)। প্রথমে সেনা গণনা—পত্তি, সেনামুখ, গুল্ম, গণ, বাহিনী, পৃতনা, চম্, অনীকিনী ও অক্ষৌহিণী—ইহাদিগের প্রত্যেকে কত মনুষ্য, কত অশ্ব, কত গজ ও কত রথ থাকে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে ব্যূহিত সৈন্যের ভিন্ন ভিন্ন চিত্রের প্রয়োজনীতা প্রদর্শিত হইয়াছে। সমস্ত সৈন্যের আধিপত্যে একজন সেনাপতি এবং অক্ষৌহিণী ইত্যাদির আধিপত্যেও এক এক জন অক্ষৌহিণীপতি ইত্যাদি নিযুক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদিগের প্রত্যেকের কার্য্য বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। ইহার পর সাঙ্গত (Parole) নির্দ্ধারিত করিবার বিধি এবং অবশেষে সেনাদিগের প্রত্যেকের কত বেতন ও কার্য্যানুসারে কত পুরস্কার এবং কাহার কি পরিমানে বৃত্তি পাওয়া উচিত তদ্বিষয় বিশেষ করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে। এ প্রকার প্রবন্ধ বিশেষ আদরণীয় তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। রামদাস বাবু আর্য্যকীর্ত্তির স্মৃতিচিহ্ন উদ্ধার করিয়া ভারতের ও বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়া স্বদেশীয়দিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইতেছেন। পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানে তাঁহার বিরাম নাই।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মাণিকদহ হিতসাধিনী সভার তৃতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণ।—১২৮৯—৯০।—

ইংরেজী শিক্ষার সম্প্রসারণে দিন দিন এতদ্দেশীয় নব্য যুবকবৃন্দের হৃদয়ে দেশানুরাগ সঞ্জীবিত হইতেছে। এই নবভাবের উদ্দীপনায় তাঁহারা নানাস্থানে সভাসমিতি-সংস্থাপন, বিদ্যালয়, গ্রন্থালয়ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠাপন, এবং নানারূপে পরদুঃখবিমোচনে যত্নবান হইতেছেন। দেশহিতকামনায় আধুনিক নব্য শিক্ষিত যুবকগণের এরূপ উৎসাহ সামান্য সুখের বিষয় নহে। যদি বঙ্গদেশের প্রতিগ্রামে দশজনলোক একত্রিত হইয়া এক একটী সদনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তনা করেন, তাহা হইলে অচিরে বঙ্গভূমির যাবতীয় অভাব নিরাকৃত হইতে পারে। আমরা এই হেতু মাণিকদহ হিতসাধিনী সভার কার্য্যবিবরণ-পাঠে একান্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। মাণিকদহ হিতসাধিনী সভা মাত্র তিনবৎসরযাবৎ স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এই স্বল্পকালমধ্যে ইহা দেশের যে উপকার করিয়াছে, তাহাতে ইহার ভাবী উন্নতি সম্বন্ধে আমাদিগের অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই দুই তিন বৎসরের মধ্যে সভা দুইটী বিদ্যালয়সংস্থাপন, একটী বথ্যাসংস্করণ, একটী জলাশয়খনন, উপযুক্ত সময়ে মাণিকদহের বাজারমিলান, ৫৮ টী দরিদ্র বালককে বেতন ও পুস্তকদান, ৪৮ টী রোগীকে চিকিৎসাপ্রদান ও একটী পুস্তকালয়ের প্রতিষ্ঠাপন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সভা প্রতিনিধিপ্রেরণপূর্ব্বক স্থানীয় অভাব জ্ঞাত হইবার উপায়বিধান, মাণিকদহের খালখনন, নূতন পথের প্রবর্ত্তন, জঙ্গলপরিষ্করণ, পোষ্টাফিস-সংস্থাপন, জাতীয় ধনভাণ্ডারের চাঁদা-সংগ্রহকরণ, অসচ্চরিত্র লোকের অত্যাচারনিবারণ প্রভৃতি নানাবিধ সৎকার্য্যের চেষ্টা করিয়াছেন। মাণিকদহবাসিগণ স্বদেশের কল্যাণসাধনমানসে যেরূপ একত্রিত হইয়াছেন, এবং যেরূপ অক্লিষ্ট পরিশ্রমসহকারে অনেক কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন, যদি বঙ্গদেশের অন্যূন একশত গ্রামও এইরূপ সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা আপনাদিগকে নিতান্ত ভাগ্যবান মনে করিব।

বাঃ।

সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ।

[এই পত্রের 'মাস সমালোচন' এবং 'সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ' ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত হয়, অতএব বিষয় বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা।]

১। চাকরি! চাকরি! হা চাকরি! যো চাকরি! সমস্ত বাঙ্গলাদেশটা—সমস্ত ভারতবর্ষটাই আজ কাল "চাকরি চাকরি" করিয়া লালায়িত হইয়া পড়িয়াছে। আর আমাদের দয়াময় ব্রিটিশ পার্লামেণ্টও ধন্য সাধ্য—পতিতপাবনী গঙ্গাদেবীর ন্যায়—তিনিও "মড়ায় আলেন না।" কিন্তু যে দেশের এবং যে সমাজের সমস্ত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকেরা কেবলমাত্র চাকরি অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সে দেশের কি কোন কালে উন্নতি হয়? আমাদের মধ্যে আজকাল অনেক দেশহিতৈষী হইয়াছেন, পতিত ভারতের উদ্ধার হউক, এমন অনেকের আন্তরিক ইচ্ছা হইয়াছে,—তাঁহাদিগকেই আমরা উপরোক্ত প্রশ্ন করিলাম। এ প্রশ্ন বড় সহজ নহে; ইহা উপেক্ষা করিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। যদি বাস্তবিকই দেশের মঙ্গলকামনা করিয়া থাক, যদি বাস্তবিকই পতিত ভারতকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছুক হও, তাহা হইলে সকলে সাহস করিয়া অতি শীঘ্র এই প্রশ্নের সম্মুখীন হও, এবং 'এদিক কিম্বা ওদিক' যাহা হয় ইহার একটা মীমাংসা করিয়া লও। ইংরাজশাসনের নূতন বন্দোবস্ত যত আমাদিগের মধ্যে প্রসারিত হইতেছে, তাহার প্রভাবে তত দিন দিন আমাদের সমস্ত পুরাতন বন্দোবস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে যে সমস্ত জীবনোপায় আমাদের ছিল, সমাজের যেরূপ শ্রেণী এবং কার্য্যবিভাগ ছিল, তাহা সমস্তই ক্রমশঃ উল্টাইয়া যাইতেছে সুতরাং আমরা ক্রমশঃ সর্ব্বতোভাবে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছি। ব্যবসায়বাণিজ্য গিয়াছে, শিল্পবিজ্ঞান গিয়াছে, দানধ্যান গিয়াছে, আচার ব্যবহার গিয়াছে,—ইংরেজেরা আমাদিগের সমস্তই বাড়িয়া লইয়াছেন, এক্ষণে সমস্তের পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র চাকরি দিতেছেন। কিন্তু এরূপ কত দিন চলিবে? সরকারি আফিস সমস্তই পরিপূর্ণ; "নস্থানং তিলধারয়েৎ।" কেবল বৎসর বৎসর যে বেল খুলিতেছে, তাহাতেই কতকগুলি মাত্র নূতন চাকরির সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু আবার জিজ্ঞাসা করি, এরূপ ভাবে কত দিন চলিবে এবং চলিতে পারে? আবার এদিকে, এত দিন পর্য্যন্ত চাকরি পাইয়া আসিয়া আমাদের স্বভাবও এমনি কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে, যে ইহা ভিন্ন ভদ্রলোকের অপর যে কোন কার্য্য আছে, তাহা একবারেই আমরা বিশ্বাস করি না অথবা বুঝি না। যাহারা গরিব, কিম্বা অর্দ্ধশিক্ষিত, তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিন; তাহারা ত 'হা চাকরি যো চাকরি' করিতেই পারে; কিন্তু যাঁহারা শিক্ষিত ও সচ্ছল-অবস্থাসম্পন্ন তাঁহাদেরও ঐ দশা। ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় দশবারবৎসর ইয়ুরোপে বিশেষ প্রশংসা এবং প্রতিপত্তির সহিত বিদ্যাশিক্ষা করিয়া দেশে প্রত্যাগত হইলেন, হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদক প্রভৃতি অত্যুচ্চ শিক্ষিত এবং সমাজের নেতাস্বরূপ মহৎ ব্যক্তিরা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট যেন ডাক্তার নিশিকান্তকে তাঁহার

জ্ঞান ও গুণোচিত কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। আমরা বলি, দ্বাদশ বৎসর ইয়ুরোপে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া এবং ডাক্তার উপাধি প্রাপ্ত হইয়া দেশে আসিয়া যদি চাকরির জন্য উমেদারী করিতে হয়, তাহা হইলে এমন লোকদিগকে দেশে ফিরিয়া আসিতে না দেওয়াই উচিত! কিন্তু এমন কথা বলে কাহার সাধ্য? সমাজের মস্তকেরা গম্ভীর-ভাবে বলিতেছেন, "ওহে বাপু! তোমরা ছেলে ছোকরা, তোমরা দুনিয়ার কি বুঝ? চাকরির অপেক্ষা সুবিধার কর্ম্ম কি কিছু আছে? মাস পোহাইলেই, হাজা শুকা নাই, 'এক মুটা' টাকা হাতে আসিবে। কোথায় 'হোরের মা, হোরের মা' করিয়া বেড়াইবে বল দেখি?" অপর এক মস্তক হয় ত বলিলেন—"অনেক দেখিলাম, অনেক শুনিলাম, কিন্তু আমি বলিতে পারি, ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলের চাকরি ভিন্ন আর কিছুই করিতে নাই, ব্যবসায় বাণিজ্য করুক—তাতি তিলি, ব্রাহ্মণ কায়স্থের সে উঞ্ছবৃত্তি পোষায় না।" এইরূপ সারগর্ভ "বৃদ্ধস্য বচনের" দ্বারা অহরহ আমাদিগকে চালিত হইতে হইতেছে, সমস্ত জাতির হাড়ে হাড়ে এই কথা প্রবিষ্ট হইয়াছে, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি ইহাকে বেদবাক্যস্বরূপ মান্য করিতেছে। যদি কেহ ইহার অবমাননা করিল, যদি কেহ অন্য পথ অবলম্বন করিল, পরিবারস্থ পিতা-মাতাস্ত্রীপুত্র হইতে সমাজস্থ বন্ধুবান্ধব পর্য্যন্ত তাহার বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইলেন। এক পয়সার সাহায্য করিলেন না, কিন্তু এমন ভয়ানক নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন যে, দুই দিন পরেই সে প্রারব্ধ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে 'মহামান্য মহাশয়' প্রভৃতি 'লম্বাচওড়া' বাক্যসম্বলিত দরখাস্ত হস্তে করিয়া পথে পথে ফিরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হইতে হইল। কিন্তু আমরা বলি, এমন করিয়া আর বেশী দিন চলিবে না, ষোলকলা সম্পূর্ণ হইয়াছে। অধঃপাতের অন্তস্তলে পতিত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই।

দেশের উন্নতি মধ্যবিত্ত লোকদিগের কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হওয়াই নিয়ম। সর্ব্বোচ্চশ্রেণিদিগের ধন আছে, সর্ব্বনিম্ন শ্রেণিদিগের পরিশ্রমের উপযোগী পাশববল আছে। কিন্তু যতক্ষণ মধ্যবিত্তদিগের বুদ্ধি এতদুভয়ের সঙ্গে মিলিত না হয় কিম্বা রীতিমত এতদুভয়কে চালিত না করে, ততক্ষণ দেশের এবং সমাজের মধ্যে কোন বৃহৎফলপ্রসূ কার্য্যের সূত্রপাত হয় না। মধ্যবিত্তদিগের বুদ্ধির চালনা দ্বারা নূতন নূতন কথা এবং প্রস্তাবের উদ্ভাবনা হয়, উচ্চ শ্রেণীয়েরা তাহাতে মোহিত হইয়া তাহার সফলোদ্দেশে অকাতরে ধন-ভাণ্ডার খুলিয়া দেয়, এবং ধন আপনার বলে নিম্নশ্রেণীস্থ শ্রমজীবি লোকদিগকে সহস্রে সহস্রে লক্ষে লক্ষে দেশের সাধারণ কার্য্যাগারে আকৃষ্ট করিয়া লয়। তখন সমস্ত সমাজ কার্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া যায়; এবং তখন দেশও শতসহস্র পথানুসারিণী উন্নতি কর্ত্তৃক সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। কিন্তু এই সুবৃহৎ কার্য্যের প্রধান কর্ত্তা মধ্যবিত্ত লোকেরা; তাহারা পথপ্রদর্শন না করিলে অগ্রগতি একবারেই অসম্ভব। অতএব আমাদের দেশেও উপস্থিত অবস্থায় যদি নূতন কোন পথ এবং উপায় উদ্ভাবিত হয়, তাহা আমাদের মধ্যবিত্ত লোকদিগের দ্বারাই হইবে। তাঁহারাই আমাদের ভরসাস্থল; তাঁহারা যদি আরও কিছুদিন উদাসীন থাকেন, তাহা হইলে সমস্ত ভারতবর্ষটা উন্নীত

না হইয়া যে অনতিবিলম্বেই রসাতলে যাইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষবাসিগণ বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন, বুদ্ধির মার্জ্জনা করিতেছেন, বিজ্ঞান আলোচনা করিতেছেন; ইতিহাস পাঠ করিতেছেন, এবং অপরাপর দেশে কি প্রকারে উন্নতি হইতেছে তাহা প্রত্যহ অবগত হইতেছেন। ইংরাজেরা ইউরোপীয় নূতন প্রথা সমস্ত প্রবর্ত্তিত করিয়া যেমন আমাদের পুরাতন সমস্তই অপহরণ করিতেছেন, তেমনি অপর দিকে বর্ত্তমান শতাব্দীর উপযোগী অনেক নূতন বিষয়ও অহরহ আমাদের সম্মুখে আনয়ন করিতেছেন। পুরাতন বন্দোবস্তের অনুসরণ করা যখন আমাদিগের পক্ষে একবারে অসম্ভব, তখন নূতন অবস্থায় যাহাতে আমরা সর্ব্বতোভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে সংলগ্ন হইতে পারি, তদ্বিষয়েই আমাদের বিশেষ চেষ্টিত হওয়া উচিত। ইহার জন্য আমরা আমাদিগের মধ্যাচিত্ত এবং শিক্ষিত লোকদিগের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকি, আমাদের চিরাভ্যস্থ জাতীয় উদাসীনতা এবং অনবধানতা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য করিব বলিয়া বদ্ধপরিকর না হইলে আর উপায় নাই।

২। শিল্পবিজ্ঞান কিম্বা ব্যবসায়বাণিজ্য যে আমাদের দেশে একবারে ছিল না তাহা নহে, শিল্প এবং কারুকার্য্যের জন্য ভারতবর্ষ চিরকাল প্রসিদ্ধ, এবং বিগত কলিকাতার মহামেলা, সে কথা অতি চমৎকাররূপে সপ্রমাণিত করিয়াছে। তৎপরে আমাদিগের মধ্যে ব্যবসায়বাণিজ্যের একেবারে অসদ্ভাব ছিল না। বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল না বটে; কিন্তু আভ্যন্তরিক বাণিজ্য যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। যতদিন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের সংস্রব হয় নাই, ততদিন আমাদের কষ্ট হয় নাই, দেশের জিনিষ দেশের মধ্যেই ক্রীত এবং বিক্রীত হইয়া আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সকল প্রকার অভাব পরিপূর্ণ করিত। কিন্তু যে দিন হইতে আমরা ইয়ুরোপীয়দিগের সংস্রবে আসিয়াছি, সেইদিন হইতেই আমাদিগের কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের আর কিছুই থাকিতে পায় না, প্রতিযোগিতা ভয়ানক প্রবল, তাহাতে আমরা দুর্ব্বল পক্ষ, দেখিতে দেখিতে আমাদের সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়া যাইতেছে। বৈদেশিক শাসন আমাদের দুর্দ্দশার আর একটী প্রধান কারণ। শাসনকর্ত্তারা সমস্তই বিদেশীয়, কাণ্ডকারখানা সমস্তই বিদেশীয়, সুতরাং দেশের টাকা দেশে থাকিবার যো নাই, শত সহস্র পথ দিয়া নিষ্ক্রামিত হইয়া যাইতেছে। এই ভয়ানক নিষ্ক্রমণ বন্ধ না হইলে আর এখন আমাদের রক্ষা নাই। কিন্তু যতদিন না আমরা, যে বিদেশীয় প্রথার দ্বারা আমরা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি, তাহাই নিজনিজ কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন করিতে পারিব, ততদিন কিছুতেই তাহা বন্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। শিল্প-বিজ্ঞান-ব্যবসায়-বাণিজ্য যাহা ছিল, তাহা আছে, কিন্তু তাহাতে এক্ষণে ইয়ুরোপীয় প্রণালী প্রযুক্ত করা উচিত; এবং নূতন ধরণে কার্য্য করিবার জন্য শিক্ষিত হইয়া আমাদিগের সাধারণ কার্য্যক্ষেত্রে সাহসের সহিত প্রতিযোগিদিগের সম্মুখীন হওয়া উচিত। শিক্ষা এবং পরিশ্রম—সকল উন্নতির মূল। একপক্ষে বিজ্ঞানের নূতন প্রণালী-সমস্ত আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে, এবং অপরপক্ষে পরিশ্রম করিয়া সেই শিক্ষা অনুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। শুধু

শিক্ষার কোন ফলই হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য চাহি। ডাক্তার সরকার বিজ্ঞানসভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের দেশের মহৎ উপকারসিদ্ধির সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু আমরা বলি, যে প্রণালীতে তাঁহার সভা হইতে বিজ্ঞানশিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহাতে আমাদের কোন আশু শুভফলাভের সম্ভাবনা নাই। গৌণফল অবশ্যই আছে, এবং তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে সম্মত না হওয়াও অতি নির্ব্বোধের কার্য্য, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, ঐরূপ না করিয়া যদি আমাদের দেশমধ্যে স্থানে স্থানে কার্য্যালয় খুলা যায়, এবং সাধারণ লোকদিগকে কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে অতি অল্পসময়ের মধ্যেই অনেক সুফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। তাহাতে পরিশুদ্ধ মার্জ্জিত বিদ্যালাভ আপাততঃ তাদৃশ হইবে না বটে, কিন্তু আসল কার্য্যশিক্ষা হইবে, এবং একবার লোকের মনে সে শিক্ষার একটু আস্বাদ প্রবিষ্ট হইলে, ভবিষ্যতে অতি সহজে সেই আসল মার্জ্জিত এবং উচ্চদরের শিক্ষার পথও পরিষ্কৃত হইয়া যাইবে। ডাক্তার সরকার আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতার পাত্র। আমরা ইচ্ছা করি যে, তাঁহার মত আরও অনেক লোকে তাঁহার ন্যায় যত্ন, উদ্যোগ, এবং অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়া দেশমধ্যে স্থানে স্থানে কার্য্যশিক্ষালয় স্থাপন করেন। ব্যবসায়ের হিসাবে এরূপ কার্য্য হইতে পারে। এক একটী কারখানাতে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি তৈয়ার করিয়া যদি বিক্রীত হয়, তাহা হইলে তাহার উপসত্ব হইতে সে কারখানার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতে পারে এবং তদুপরে লাভও হইতে পারে: অপর পক্ষে, সেইরূপ এক একটী কারখানা সাধারণ লোকের শিক্ষা সম্বন্ধে এক একটী কলেজের উদ্দেশ্যসাধন করিতে পারে। তবে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন, বিলাত কিম্বা আমেরিকাতে এক এক ব্যক্তি উপার্জ্জনাকাঙ্ক্ষায় এরূপ বৃহৎ শত শত কারখানা রোজ রোজ প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন; আমাদের দেশে সে সময় এখনও হয় নাই; একজনের কিম্বা দুইজনের দ্বারা এরূপ বৃহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু জাতীয় অর্থের দ্বারা, সাধারণভাবে অর্থ সংগৃহীত হইয়া, ইহা অবশ্যই হইতে পারে; এবং আমাদের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এইরূপ ভাবেই হওয়াই উচিত। প্রস্তাবিত ন্যাশনালফণ্ডের ইহা অপেক্ষা আর বেশী উপযুক্ত কার্য্য কি আছে?

৩। কিন্তু বিশুদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন ভিন্ন প্রস্তাবিত ন্যাশনাল ফণ্ডের এরূপ কোন উদ্দেশ্য আছে কি না তাহা আমরা শুনিতে পাই নাই। রাজনীতির দিকেই আমাদের অত্যন্ত ঝোঁক; দশটা কথা লইয়া হজুক করিতে পারিলেই আমরা পরিতৃপ্ত হই। ঘরের পয়সা লাগে না, দৈহিক পরিশ্রম লাগে না, মনের ঐকান্তিকতার আবশ্যক হয় না;— উপর উপর না ভূত না ভবিষ্যৎ কতকগুলা গোলযোগ করিয়া আমরা সময় অতিবাহিত করিয়া থাকি। কিন্তু ওদিকে সময়ের স্রোত চলিতেছে; ভারতবর্ষের যথাসর্ব্বস্ব ধৌত করিয়া সে স্রোত অতল সাগরগর্ভে মিলিত হইতেছে। আর আমরা দেশশুদ্ধ লোক সেই স্রোতে দেহ ভাসাইয়া দিয়াছি। কিন্তু আমরা ভাসিয়াই যাইতেছি; কোথাও আটকাইয়া শস্যশ্যামলপর্ণ চরের সৃষ্টি করিতে

পারিতেছি না। পরমাণুর সঙ্গে পরমাণুর সংলগ্ন হইলে তবে নদীগর্ভে চরের সৃষ্টি হয়, কিন্তু আমাদের সে সংলগ্ন হইবার ক্ষমতা নাই। কোথা হইতে থাকিবে? উদরে অন্ন নাই যে দুইদিন প্রাণধারণ করিয়া প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করিব। সুতরাং সমাজের একটী পরমাণুরও অণুমাত্র স্থিতি নাই, অদ্য জলবুদ্বুদের ন্যায় দেখা দিতেছে, কল্য খরস্রোতে প্রবাহিত হইয়া অতলস্পর্শে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এরূপভাবে চলিলে কি আর আমাদের কখন উদ্ধার হইবে? আমাদের মত এই যে, রাজনৈতিক আন্দোলন আমাদের মধ্যে যেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, অচিরাৎ তাহার কিছু সামা হওয়া উচিত; এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে শিল্প এবং বিজ্ঞানচর্চ্চার আরম্ভ হওয়া উচিত। যে সকল কার্য্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে জাতীয় ধনোৎপত্তি এবং সাধারণ লোকের অন্নসংস্থান হয়, তাহাতেই এক্ষণে আমাদিগকে লিপ্ত হইতে হইবে। রাজনীতির আন্দোলনের জন্য দেশ মধ্যে স্থানে স্থানে সভা এবং সম্প্রদায় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; আমরা বলি, এই সভা এবং সম্প্রদায়সকল রাজনীতির সঙ্গে উপরোক্ত কার্য্যসকলও কি আপন কর্ত্তব্যের অধীন করিতে পারেন না? আমাদের যে পুরাতন জ্ঞান এবং শিক্ষা আছে, তাহাকে একবারে পরিত্যাগ না করিয়া, তাহাকেই ভিত্তিস্বরূপ রাখিয়া, তদুপরে ইউরোপীয় নূতন জ্ঞান এবং শিক্ষা স্থাপিত করিয়া তাহা দেশ মধ্যে বহুলরূপে প্রচারিত করাই আমাদের প্রধানউদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং এই জ্ঞান ও শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কার্য্যশিক্ষা যাহাতে হয় তাহার উপায় উদ্ভাবিত হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা বিবেচনা করি, সর্ব্বসাধারণে, বিশেষতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোকেরা, স্থানে স্থানে সম্প্রদায়বদ্ধ হইয়া যতদিন পর্য্যন্ত এবিষয়ে না চেষ্টা করিবেন, ততদিন এরূপ শিক্ষা এবং কার্য্যপ্রচারের কোন সম্ভাবনাই নাই। রাজনীতির আন্দোলন যেমন হইতেছে হউক, কিন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভাবের অপবাংশটা যাহাতে একবারেই উপেক্ষিত না হয়, তাহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। সমাজের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি যদি এরূপ কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া মান্য করিয়া লয়েন, এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের হৃদয় যদি আত্মোন্নতি এবং দেশোন্নতির ভাবে উদ্দীপ্ত হয় তাহা হইলে আমাদের দুর্দ্দশা দূরীভূত হইতে কয় দিন লাগে? অনেকে বলিবেন, সভা করিয়া, সম্প্রদায় বাঁধিয়া বিজ্ঞানচর্চ্চা কিম্বা কার্য্যশিক্ষা হয় না; কিন্তু আমরা বলি, সে কথাটী সম্পূর্ণ ভুল। সম্প্রদায় কিম্বা দল না বাঁধিলে কোন কার্য্যই হয় না। অদ্য যদি বাঙ্গালাদেশমধ্যে এই উদ্দেশ্যে একটী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, যদি তদ্ভুক্ত ব্যক্তিরা পূর্ব্ব হইতে আপনাদিগের কার্য্যপ্রণালী স্থিরীকৃত করিয়া লয়েন, এবং তৎপরে স্থান বুঝিয়া ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যশিক্ষার জন্য এক একটী কারখানা খুলেন, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনতিকালমধ্যেই আমাদিগের মধ্যে একটী অসাধারণ সমাজিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া উঠে। কথাটা হঠাৎ অসম্ভব এবং অলীক বলিয়াই বোধ হইবে, কিন্তু যদি কখন বিজ্ঞান এবং কার্য্যশিক্ষা প্রভূতপরিমাণে ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়, তাহা হইলে এইরূপ করিয়াই হইবে, অন্য উপায় নাই। হঃ মঃ।

নানা কথা।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের একটী মাত্র পুত্র জীবিত আছে। অন্ন কষ্টে সেও বা প্রাণ ত্যাগ করে! রাজনারায়ণ দত্তের পৌত্র ও মধুসূদনের পুত্র—সাগরদাঁড়ির দত্তগোষ্ঠির একমাত্র বংশধর—আজ একমুষ্টি উদরান্নের জন্য পরমুখাপেক্ষী—সাধারণের দ্বারের ভিখারী,—ইহা ভাবিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। পুত্রের এই কষ্ট অবশ্য পিতার দোষে তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু মধুসূদন পুত্রপরিবার বা নিজের জন্য জন্মেন নাই, তিনি জন্মিয়াছিলেন—মাতৃভাষার জন্য ও স্বদেশীয় সাহিত্যের জন্য। অতএব মাতৃভাষার প্রতি, স্বদেশীয় সাহিত্যের প্রতি ও অসাধারণ কবিত্বের প্রতি যাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্রও মমতা আছে, তাঁহারা কোন্ প্রাণে 'মাইকেলের' ছেলেটীর এই দুর্দ্দশা চক্ষে দেখিতেছেন ও কর্ণে শুনিতেছেন, আমরা বলিতে পারিনা। বঙ্গের প্রধান কবি মধুসূদন দত্তের পুত্র যদি 'একমুঠা ভাতের' জন্য মারা পড়ে তাহা হইলে বাঙ্গালী নিশ্চয়ই প্রত্যবায়ী হইবেন। তার পর সাগরদাঁড়ির দত্ত ও ঘোষপরিবার, বিদ্যানন্দ কাটীর বাবুগণ, ও বাড়ুলী কাটীপাড়ার জমীদারমহাশয়দিগের নিকট জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সকল শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকা তাহাদের কি ভাল দেখাইতেছে? তাঁহাদের হৃদয়ে কি একবিন্দু আবেগ নাই?—একটু স্নেহদয়া নাই? বাবু চন্দ্রমোহন দত্ত উদ্যোগী হইলে, সাগরদাঁড়ি অঞ্চলের সকলেই 'মধুর ছেলের' জন্য কিছু কিছু ত্যাগস্বীকার করিবে, ইহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। তবে কথাটা বহুলরূপে প্রচার হওয়া আবশ্যক। অনেকেই জানে না যে, মাইকেলের 'সন্তানসন্ততি' কিছু আছে। দৈনিক ও সাপ্তাহিক সহযোগিগণ এসম্বন্ধে দুই চারিটী কথা লিখিলে বা আমাদের কথা উদ্ধৃত করিলে বাধিত হইব। কোন কোন সহযোগী আমাদিগের বলিবার পূর্ব্বেই এ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

যাঁহারা এক্ষণে বিদ্যালয়সমূহের বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচনী সভার সদস্য, তাঁহারা সকলেই সদ্বিদ্যা ও সদ্গুণসম্পন্ন ব্যক্তি; অতএব তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু তাঁহারা সকলেই যে বাঙ্গালা সাহিত্যের সুবিচারক, একথা বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি এবং তাঁহারা নিজেও বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না,—কেননা তাঁহারা সকলেই কৃতী ও উদার প্রকৃতির লোক,—তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই বাঙ্গালা-ভাষা ও সাহিত্যে তাদৃশ ব্যুৎপত্তি নাই। 'বুককমিটীর' অধিকাংশ সভ্য অন্যান্য গুরুতর বিষয়ে এত অধিক পরিমাণে ব্যাপৃত যে তাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি যথোচিত মনোযোগ প্রদান করিতে অসমর্থ, অতএব বাঙ্গালা-পুস্তক নির্ব্বাচনের ভার উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা তাঁহাদের আপনাদেরই কর্ত্তব্য। অবশ্য আত্মাভিমান মনুষ্যপ্রকৃতির অপরিহার্য্য দুর্ব্বলতা তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু যাঁহারা অন্যান্য নানাবিদ্যা ও গুণের আধার ও যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ মহৎকার্য্য সুসম্পাদিত করিয়া স্বদেশের

উপকার ও গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিতে সমর্থ,—তাঁহাদের পক্ষে যৎসামান্য বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যুৎপত্তির অভাব স্বীকার করাতে বিশেষ লজ্জা ও অগৌরবের বিষয় কি? গবর্ণমেণ্ট নিজের ইচ্ছানুসারে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন সত্য। কিন্তু এরূপবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ভ্রম হইবারই কথা,—অতএব যাঁহারা নিয়োজিত হইয়াছেন তাঁহাদের আপনাদেরই উচিত উক্ত ভ্রম সংশোধন করিয়া দেওয়া। তবে যদি যৎসামান্য স্বার্থ-সিদ্ধি ও অকিঞ্চিৎকর প্রভুপ্রিয়তাই জীবনের সকল কার্য্যেরই উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে অবশ্য আমরা কথাটার যেরূপ ভাবে অবতারণা করিয়াছি তদ্দ্বারা কোন ফল হইবার সম্ভাবনা নাই।

সম্প্রতি 'সাধারণী' সংবাদপত্রে উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 'সাধারণী' একটী প্রবন্ধের এইরূপ সকরুণ উপসংহার করিয়াছেন,—

"আমরা সকল সহিতে পারি, কিন্তু মাতৃভাষার অবমাননা, মাতৃভাষার উপর অত্যাচার প্রাণান্তেও সহিতে পারি না। যাঁহারা বাঙ্গালাভাষার প্রকৃত হিতৈষী, যাঁহাদের হৃদয়ে অণুমাত্রও দেশহিতৈষিতা আছে তাঁহারা এই সময়ে ভাষার সম্মানরক্ষা করিতে সচেষ্ট হউন। সভা সমিতি করিয়া গবর্ণমেণ্টকে সকল কথা বুঝাইয়া দিতে যত্ন করুন। জয়দেবপুরের সাহিত্যসমালোচনী সভা ও কলিকাতার সারস্বতসমাজ কি এ বিষয়ে কিছু করিবেন না? আর বিলম্বে কাজ নাই। সকলে একত্র হউন। সকলে একত্র হইয়া, সমবেত চেষ্টার মহিমা প্রদর্শন করুন। আমরা আমাদের পবিত্র ভাষার জন্য, অসহায় বাঙ্গালা গ্রন্থকারদিগের জন্য সকলকেই বলিতেছি—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'।"

'সাধারণীর' ঐ কথাগুলি আমরা সম্পূর্ণ রূপে অনুমোদন করি। যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালাসাহিত্য ও বাঙ্গালাগ্রন্থকারদিগের সম্ভ্রমরক্ষার জন্য সাহিত্যানুরাগী সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই এ সময়ে আন্দোলন করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে সাময়িক ও সম্বাদপত্রসম্পাদকগণ স্ব স্ব মতামত প্রকাশ করিলে অনুগৃহীত হইব।

পাঠ্যপুস্তকনির্ব্বাচন-সম্বন্ধে 'সই সুপারিস' উঠিয়া যায় ও পুস্তকের উপযুক্ততা-অনুসারে তাহা নির্ব্বাচিত হয়, ইহাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু "শিক্ষাবিভাগের কোন কর্ম্মচারী, কোন স্কুল বহি লিখিতে পারিবেন না, এরূপ একটী নিয়ম থাকা উচিত"—'সাধারণীর' এই প্রস্তাব আমরা আদৌ অনুমোদন করিনা; কেননা তদ্দ্বারা সাহিত্যের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র কিয়ৎপরিমাণে সংকীর্ণ করা হয়.এবং শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারিদিগের প্রতিও অযথা কাঠিন্য প্রকাশ করা হয়। পুস্তক-প্রণয়ন-সম্বন্ধে সকলেরই সমান অধিকার থাকা উচিত। এই অধিকারের প্রতি আঘাত করা অন্যায় ও অনিষ্টকর। যিনি ইচ্ছা তিনি পুস্তক লিখুন, পুস্তকের শ্রেষ্ঠত্ব-অনুসারে তাহা নির্ব্বাচিত হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। কিন্তু যতদিন না পুস্তকনির্ব্বাচন-সভায় বঙ্গসাহিত্যাভিজ্ঞ ও অপক্ষপাতী সদস্য নিযুক্ত হয়, আমাদের প্রার্থনা কদাচিৎ পূর্ণ হইবে। বাবু চন্দ্রনাথ বসুকে 'বুক কমিটীতে' গ্রহণ করার জন্য 'সাধারণী' যে অনুরোধ করিয়াছেন, আমরা তাহার পোষকতা করিতে কুণ্ঠিত নহি। আমাদের লক্ষ্যপথে

আরও কযেক ব্যক্তি আছেন, যদি কখনও সময উপস্থিত হয নাম করিব।

সাধারণীর আর একটী কথা এই যে, 'বিদ্যালয-পাঠ্য কোন সদগ্রন্থের অভাব হইলে তাহা প্রণযনজন্য উপযুক্ত ব্যক্তি বিশেষকে নিযুক্ত করাই বিধেয'। এরূপ প্রণালী স্থলবিশেষে শুভপ্রদ হইলেও হইতে পারে কিন্তু সাধারণতঃ উহা সংকীর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। উহা দ্বারা যে সকল অনিষ্টোৎপাদিত হইবার সম্ভাবনা তাহা সাধারণী সম্পাদকের ন্যায তীক্ষ্ণ ও দূরদর্শী ব্যক্তির বিবেচনাধীন না হওয়াই আশ্চর্য্য। বিশেষতঃ বঙ্গ-সাহিত্যে আজ কাল যাঁহারা 'মহারথী' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও শক্তির যখন অকালে অযথা হ্রাস হইতে দেখিতেছি, তখন পুস্তক-প্রণযন সম্বন্ধে কিরূপে উল্লিখিত প্রথার অনুমোদন করিতে পারি।

// লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙ্গালাগ্রন্থকারের শক্তি অসময়ে ক্ষয় হইতে আরম্ভ হওযার অসম্ভাবনা কি? যদি অসম্ভবই হইবে তবে 'পশুপতি সম্বাদ' লিখিত ও প্রকাশিত হইল কেন? এই 'পশুপতি সম্বাদ' যে মস্তিষ্ক হইতে নির্গত হইযাছে বলিযা লোকে ঘোষণা করিয়াছে, তাহা যদি সত্য হয, তবে সে মস্তিষ্কে আর তেজ' কোথায়? আর বঙ্গ সাহিত্যের আশাই বা কোথায? 'পশুপতি সম্বাদ' শ্লেষ ও সাহিত্যাংশে কিছুই নয় আমরা গত পূর্ব্বপক্ষে বলিয়াছি। উহাতে কল্পনা নাই, কবিত্ব নাই, বৈচিত্র নাই, সংগঠনক্ষমতা নাই, রূপ রস ভাব চিত্রনৈপুণ্য—কিছুই নাই; আছে কেবল কতকগুলা 'নোংরা' কথা আর একটা অস্বাভাবিক দুর্গন্ধ। কিন্তু তথাচ দেখিতেছি সেই 'পশুপতিসংবাদে' কেহ কেহ বিমোহিত হইযা পড়িযাছেন। কেহ তদ্দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের গৌরববৃদ্ধি করিতেছেন, কেহ বা 'বিগত বৎসর প্রসূত' সাহিত্যের সর্ব্বোচ্চস্থানে তাহাকে সংস্থাপন করিযা গৌরব গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিতেছেন। কোন সহযোগী 'সধবার একাদশী', 'কল্পতরু', 'ভারত উদ্ধার' প্রভৃতি ব্যঙ্গসূচক উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলির সহিত 'পশুপতি সম্বাদের' তুলনা করিযা শেষোক্তকে কিযৎপরিমাণে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হযেন নাই। এ সকল ব্যাপারের অর্থ কি আমরা বস্তুতই বুঝিযা উঠিতে পারি না। বঙ্গসাহিত্য যথার্থই কি 'অকাল কুষ্মাণ্ডে' পরিণত হইতে চলিল? যিনি 'কল্পতরু' ও 'ভারত উদ্ধারের' সহিত 'পশুপতি সংবাদের' তুলনা করিযাছেন, সাহিত্যসম্বন্ধে তাঁহার বিচারশক্তি বিলক্ষণ শ্রেষ্ঠ বলিযা আমরা জানিতাম; অতঃপর সেই শক্তিও কি হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল? না বন্ধুতার অনুরোধেও 'প্রিযম ব্রূযাৎ'এর খাতিরে সহযোগীর পদস্খলিত হইল? যাহাই ঘটিযা থাকুক উভযদিকেই মাতৃভাষার ক্ষতি। সাহিত্যের সাধারণভূমিতেও যদি কেবল নামের মাহাত্ম্য গীত ও সত্যবিহীন 'প্রিয়ম ব্রূযাৎ' প্রতিধ্বনিত হয়, তাহাহইলে 'বুককমিটীর' মেম্বরগণের আর বিশেষ অপরাধ কি? আর বাঙ্গালাভাষার উন্নতিরই বা সম্ভাবনা কোথায়? আমরা অকাল কুষ্মাণ্ডবাদের অবশ্য সমর্থন করি না তবে আমাদের 'মহারথি'দিগকে শকট-চালকে পরিণত হইতে দেখিলে যথার্থই মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হই। কে না ব্যথিত হয়? 'শকুন্তলাতত্ত্ব' প্রণেতাকে সকলেই যথোচিত সম্মান করিয়া থাকে, আমাদিগেরও তাঁহার প্রতি

সম্মানের কিঞ্চিন্মাত্রও অভাব নাই। কিন্তু স্থলবিশেষে যখন তাঁহার শক্তির 'অধোগতি' হইয়াছে, তখন তাহা স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দেওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা তাঁহার অসম্মান করা হইবে না প্রত্যুত উপকার করা হইবে। অতএব স্বদেশীয় সাহিত্যের সম্ভ্রম রক্ষার্থে যদি অপার্থিমানে ব্যক্তিবিশেষকে অসন্তুষ্টই করিতে হয় তাহাতেই বা হানি কি?

বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'অকাল কুষ্মাণ্ড' নামক প্রবন্ধে আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের একটী অতি রঞ্জিত কুচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রবন্ধটীতে বিচারক্ষমতা অপেক্ষা বিদ্রূপপ্রিয়তার ভাগ অধিক। লেখকের বর্ণনচাতুর্য্য প্রশংসনীয়, কিন্তু সমালোচনশক্তি এখনও তাদৃশ বিকাশলাভ করে নাই। অতএব রজ্জুকে সর্পজ্ঞানে তাহার উপর ক্রমাগত লগুড় প্রহার করিয়াছেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। রবীন্দ্রবাবু ছবির 'রং' ফলাইতে বিলক্ষণ দক্ষ। অকাল'কুষ্মাণ্ড'ছবিখানা কোন প্রকৃত দ্রব্যের প্রতিকৃতি না হইলেও, দেখিতে মন্দ হয় নাই। তবে চিত্রকর্ত্তার অবিশ্রান্ত ভ্রূকুঞ্চন ও নেত্রসঞ্চালনে 'রং'টা কিছু খরিয়া গিয়াছে। 'নির্ঝরিনীর স্বপ্নভঙ্গ' এবং 'ছবি ও গানের' রচয়িতা নিম্নশ্রেণীর কবি নহেন। কবি যদি সমালোচকরূপে মাতৃভাষার সেবা করিতে উৎসুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বালস্বভাবসুলভ চাপল্য ও অযথা কৌলিন্যাভিমান ত্যাগ করিয়া ধীরতা ও উদারতাকে আশ্রয় করিলেই বোধ হয় ভাল হয়। সাহিত্যই হউক আর যাহাই হউক সংসারে কোন দ্রব্যই চিরকাল 'একচেটে' থাকে না;—থাকা অস্বাভাবিক। ইহা স্মরণ রাখিয়া দ্রব্যের দোষগুণ বিচার করিলে ভাল হয় না কি? তীক্ষ্ণতা ভারত্বের সহিত সংমিলিত না হইলে স্থূল ও কঠিন দ্রব্য কাটিতে পারে না ইহ ও কি আমার স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে?)

এক্ষণে সুলভ মূল্যের বাঙ্গালা 'সাপ্তাহিকে' সময়ে সময়ে 'বিলাতের পত্র' প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রগুলির সমস্তই যে বিলাতের 'প্রত্যক্ষ ঘটনা' চাক্ষুষ করিয়া লিখিত হইয়া থাকে তাহা নহে, কোন কোন পত্র বিলাতী গ্রন্থ হইতেও সংগৃহীত হইয়া থাকে। এই দ্বিবিধ উপায় দ্বারা বিলাতের পত্র প্রণয়ণ করার উদ্দেশ্য অবশ্য একই;—অর্থাৎ ঘটনাবৈচিত্রদ্বারা পাঠকদিগের মনরঞ্জন করা। উদ্দেশ্য অতি মহৎ তাহাতে সন্দেহ কি? তবে কি না বিলাত ও বিলাতী গ্রন্থ ঠিক একই 'দ্রব্য' নহে আর পরের দ্রব্য না বলিয়া গ্রহণ করাটাও বড় পুণ্যের কার্য্য নয়, এমন একটা ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু ব্যবস্থাটা বহুকালের পুরান। পুরান বলিয়াই হউক,—আর নিজের রাজনৈতিক চিন্তার আতিশয্যবশতঃই হউক, উল্লিখিত 'বিলাতের পত্র'প্রকাশক 'সাপ্তাহিক' সে ব্যবস্থাটা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গিয়া থাকিবেন। অথবা উদারচেতার পক্ষে 'আত্মপরপ্রভেদাভাব' এই মহাবাক্য অবলম্বনে 'বিলাতের পত্র' বিরচিত ও প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পোড়া পৃথিবীর সকল লোক কথার সদর্থ গ্রহণ করে না। তাহাদের মধ্যে হয়ত অনেকেই বিলাতের পত্র সম্বন্ধে অসদর্থ করিয়াছিল, কিন্তু মনের পাপ মনেই রাখিয়াছেন, প্রকাশ করে নাই। সম্প্রতি সঞ্জীবনীসম্পাদক

সেটী করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন 'বিলাতেরপত্র' কোন অবজ্ঞেয় বৃত্তিবিশেষের দ্বারা সৃষ্ট, অতএব 'দণ্ডবিধি' আইনের ধারা-বিশেষের অধিকারাধীন, আমাদের বিবেচনায় 'সঞ্জীবনী'সম্পাদক ন্যায়ের কঠোরতাকে উদারতার কোমল স্পর্শে কিঞ্চিৎ প্রশমিত করিলেও করিতে পারিতেন। রমাসমেত আসামীকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ না করিয়া দুই একবার সতর্ক করিয়া দিলে মন্দ হইত না। আসামী যে এজাহার দিয়াছেন তাহা সন্তোষজনক নহে।

খ্রীষ্টানসমাজের একখানি অতি কুৎসিত চিত্র সাধারণের সম্মুখ হইতে অপসারিত হইল। হেষ্টি পিগট মামলা শেষ হইয়া গিয়াছে। আপীল আদালত নিম্ন-আদালতের বিচার রদ করিয়া কুমারী পিগটের স্বপক্ষে ডিক্রি দিয়াছেন। পিগট 'ক্ষতিপূরণ'বাবদে তিন হাজার টাকা পাইবেন ও তদ্ভিন্ন মকর্দ্দমা-খরচা পাইবেন; সর্ব্বসমেত প্রায় দশ-হাজার টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু মিঃ হেষ্টি অগ্রেই এখান হইতে পটল তুলিয়াছেন, —আর না কি বলিয়া গিয়াছেন যে, ডিক্রির টাকার এক পয়সাও তিনি দিবেন না। এই খ্রীষ্টান কুল-কলঙ্কের হিন্দু বিদ্বেষের কথা-অবশ্য সকলেরই স্মরণ আছে। আর উপরোক্ত মোকদ্দমার বিচারক-ধুরন্ধর মিঃ নরিস 'এক আনার' ডিক্রি দিয়া যে অগাধ বিচারশক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাও বোধ হয় কেহ ভুলেন নাই।

জনরব যে, খার্টুম শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছে ও জেনারল গর্ডন বন্দী হইয়াছেন।

রহরমপুর কলেজের প্রধান শিক্ষক লেভিংষ্টোন সাহেব তাঁহার ছাত্রদিগের শাসনার্থ একখানি অপূর্ব্ব পিনালকোড প্রস্তুত করিয়াছেন। এই অভিনব ফৌজদারী আইনে এক হইতে দুই শত বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। ঐ ব্যবস্থার সমালোচনপ্রসঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান নেশন' বলেন যে আজ কাল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা কোন দ্রব্যের গুণাগুণ স্থিরীকৃত হইলে পর তবে সে দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অতএব লিভিংষ্টোনের উচিত যে, দুই শত বেত্রাঘাত 'আহার' করিয়া মনুষ্য জীবিত থাকিতে পারে কি না তাহা নিজের শরীরে অগ্রে পরীক্ষা করা। মাষ্টারমহোদয় দুইশত 'বেত্র' খাইয়া যদি জীবিত থাকেন তবে ত কথাই নাই, কিন্তু যদি মৃত্যুও হয় তাহা হইলেও তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইবে;—কেননা বৈজ্ঞানিক সত্য-আবিষ্কারের জন্য প্রাণত্যাগ করা কয় জন লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? বলা বাহুল্য যে, সাপ্তাহিক সহযোগী যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই অনুমোদনীয়।

বিলাতের 'নোটীস্ এণ্ড কোয়ারিজ' নামক পত্রিকা বলেন যে, হরিদ্বর্ণ গোলাপফুলের অস্তিত্ব অনেকে অবগত নহেন। আমেরিকা মেরিল্যাণ্ড জিলার বালটীমোর নগরে কোন ভদ্রলোকের উদ্যানে হরিদ্বর্ণ গোলাপপুষ্পের তিনটী বৃক্ষ আছে। হরিদ্বর্ণ গোলাপ দেখিতে যেমন সুন্দর, ইহার গন্ধও তেমনি উন্মত্তকারী। ইউরোপ বা এসিয়ার কোন স্থানে হরিদ্বর্ণ গোলাপপুষ্পের বৃক্ষ দেখা যায় না।

আফ্রিকার বন্য হংস প্রতি ঘণ্টায় ৪৫ ক্রোশ উড়িয়া গমন করিয়া থাকে!

হেলার নামক প্রাণিতত্ত্ববিৎ বলেন,

একটী স্ত্রীমক্ষিকা এককালে ২ কোটী ৮০ হাজার ৩ শত ২০টা ডিম্ব প্রসব করে!!

মার্কিণের একজন অধ্যাপক বলেন, মনুষ্য স্বভাবতঃ চতুষ্পদ। শৈশবাবস্থায় মনুষ্য যে হস্তপদ উভয়ে ভর দিয়া চলে, ইহাই তাহার প্রমাণ। ক্রমে শিক্ষাগুণে বালকেরা কেবল পশ্চাৎপদে ভর দিয়া চলিতে আরম্ভ করে। ইহাতে দেহযন্ত্রের পরিবর্ত্তন ঘটে, সুতরাং তাহারা অবশেষে দুই পদে ভর দিয়া চলিতে আর কষ্ট বোধ করে না। কিন্তু ইহাতে শরীরের অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। অধ্যাপক বলেন, শিশুদিগকে যদি দাঁড়াইতে শিখান না হয়, তাহাহইলে ক্রমে তাহারা হস্তপদে ভর দিয়া চতুষ্পদজীবদিগের ন্যায় গতিবিধি করিবে। অধ্যাপকেরও বুদ্ধিটা চতুষ্পদের ন্যায় বোধ হইতেছে!

সংপ্রতি প্রফেসার ডুয়ারিং সাহেব এক প্রকার আবরক তৈয়ার করিয়াছেন, ইহাতে অগ্নির দাহিকাশক্তি নিবারণ করে। এই আবরকে তিনি সাধারণতঃ লিখিবার কয়েক খানা কাগজ, সরুকাপড় ও কাষ্ঠ ভিজাইয়া দেখিয়াছেন, সে গুলি অগ্নিতে দগ্ধ হয় নাই। অনেকক্ষণ অগ্নিতে ধরিয়া রাখিলে একপ্রকার ধূম বিনির্গত হয় বটে, কিন্তু অগ্নি জ্বলিয়া উঠে না।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত পারাগোয়া দেশের জঙ্গলে লেজবিশিষ্ট একপ্রকার মনুষ্য দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের শরীরে লোম নাই। পশ্চাদ্ভাগে ১০। ১২ ইঞ্চি পরিমাণ একটি লেজ আছে। ইহারা না কি কথাবার্ত্তা বলিতে পারে।

প্রভাতী বলেন, বানরেরা মানুষের ন্যায় অনেক কায করিয়া থাকে। কোন কোন জায়গায় বানরে পাখাটানার কার্য্য করিয়া থাকে শুনিয়াছি। কিন্তু অঞ্জনানন্দন ব্যতীত তাহাদিগের মধ্যে আর কেহ মানুষের ন্যায় সকলকার্য্য করিতে পারে, ইহা আমরা কখন শুনি নাই। সম্প্রতি আফ্রিকার এক খানি সংবাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছে যে, তথাকার এক রেলওয়ে ষ্টেসনের টেলিগ্রাফ আফিসের একটী বানর সিগ্‌নালারের কার্য্য করিতেছে। এই টেলিগ্রাফ ঘরে একজন মনুষ্যসিগ্‌নালার ছিল, কিন্তু রেলের গাড়ীতে তাহার হাতপা কাটিয়া যাওয়ায় সে যন্ত্র চালাইতে পারেনা। পূর্ব্বে বানরকে সে এই কায শিখাইয়াছিল, সুতরাং এখন স্বয়ং অপারক হইয়া বানর দিয়া আপনার কায চালাইতেছে। এই বানর আবার স্বীয় প্রভুকে ঠেলাগাড়িতে চড়াইয়া গাড়ী ঠেলিয়া এক-স্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যায়।

এক্ষণে প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় আকাশ যে গাঢ় লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে, সায়েন্টিফিক আমেরিকান পত্রে তাহার কারণ এইরূপ বিবৃত হইয়াছে;—বৃহস্পতি গ্রহের উপরে লোহিতবর্ণের একখানি মেঘ সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। কয়েকমাস হইতে বৃহস্পতিতে এই লোহিত মেঘ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ইহা বৃহস্পতি হইতে অন্তর্দ্ধান হইয়া পৃথিবীর দিকে আসিয়াছে, সেইজন্য পৃথিবীর আকার প্রাতঃসন্ধ্যা লোহিতবর্ণে রঞ্জিত দৃষ্ট হয়। কি জন্য বৃহস্পতি হইতে এই মেঘ অন্তর্হিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন কথা উল্লিখিত হয় নাই।

পাক্ষিক সমালোচক।

প্রথম খণ্ড।] সন ১২৯১ সাল ; জ্যৈষ্ঠ, প্রথম পক্ষ। [সপ্তম সংখ্যা।

যোগ-রহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

প্রাকৃতিক মনুষ্যেরা অতি জঘন্য অভিলাষ চরিতার্থের নিমিত্ত অতি যৎসামান্যাকারের চাক্ষুষী-বিদ্যা বা তাহার আভাস মাত্র অভ্যস্ত করিয়া থাকে। পরন্তু যোগীরা অতি উচ্চতমক্ষমতালাভের নিমিত্ত যাহা যাহা উচ্চতম দৃষ্টিবিজ্ঞান বা চাক্ষুষী বিদ্যা—তাহারই অনুশীলন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের যোগশাস্ত্রে যে "ত্রাটক" নামক যোগের উল্লেখ আছে, তাহা সেই অদ্ভুত দৃষ্টিবিজ্ঞান বা চাক্ষুষী বিদ্যার ক্ষুদ্রতমশাখামাত্র। দৃক্‌শক্তি বাড়াইবার জন্য, সূক্ষ্ম ও ব্যবহিত বস্তু দেখিবার জন্য, সিদ্ধগন্ধর্ব্বাদি অমানবপ্রাণীসন্দর্শনের জন্য, চাক্ষুষ জ্যোতিকে স্বাধীন করিবার জন্য, নিদ্রাতন্দ্রাদি অশেষ বিশেষ চাক্ষুষ-দোষ-বিনাশের জন্য, প্রথমতঃ তাঁহারা ত্রাটক-বিদ্যা বা ত্রাটক-যোগ শিক্ষা করেন। ত্রাটক-বিদ্যা শিখিবার প্রথম সোপান এই—

"নিরীক্ষেন্নিশ্চলদৃশা সূক্ষ্মলক্ষ্যং সমাহিতঃ।
অশ্রুপ্রপাতপর্য্যন্তমাচার্য্যৈস্তৎ ত্রাটকং স্মৃতম্॥
ত্রোটনং নেত্ররোগানাং তন্দ্রাদীনাং কবাটকম্।
এতচ্চ ত্রাটকং গোপ্যং যথা হাটকপেটকম্॥"

কোন এক সজ্যোতি বস্তুর (ধাতু অথবা প্রস্তরের) দ্বারা প্রস্তুত সুন্দর, সুদৃশ্য বা নেত্রপ্রীতিকর একটী সূক্ষ্ম লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া, অনন্তর যোগাসনে উপবিষ্ট ও তন্মনা হইয়া নির্নিমেষ-নেত্রে কেবল তাহাই দেখিতে থাকিবে। যতক্ষণ না চক্ষে জল আইসে—ততক্ষণ দেখিবে। শরীর না নড়ে, পলক না পড়ে, মন বিচলিত না হয়, এরূপ নিয়মে, চক্ষে জল আসা পর্য্যন্ত সেই দৃশ্যের প্রতি চক্ষুকে বা দৃষ্টিকে আবদ্ধ রাখিবে। চক্ষে জল আসিলেই তাহা আর দেখিবে না। কিছুকাল এইরূপ করিলেই দৃক্‌শক্তি বাড়িয়া যাইবে। চক্ষুর দোষ সকল নষ্ট হইবে। নিদ্রা-তন্দ্রাদি স্বাধীন হইবে, এবং চক্ষুর রশ্মিনির্গম-প্রণালী বিশুদ্ধ হইয়া আসিবে।*

ত্রাটক বিদ্যার অপর সোপান এই যে,—

"গাঢ়াতপে স্বপ্রতিবিম্বমীশ্বরং
নিরীক্ষ্য বিস্ফারিতলোচনদ্বয়ম্।
যদাঙ্গণে পশ্যতি স্বপ্রতীকম্
নভোঙ্গণে তৎক্ষণমেব পশ্যতি।" (?)

* * * * *

প্রখর রৌদ্রের সময় আত্মপ্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ পূর্ব্বক আকাশে নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত

* আমাদের দেশে যে শালগ্রামশিলা, ধাতুনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি ও ত্রিকোণাকার স্বস্তিকযন্ত্র প্রভৃতি সম্মুখে রাখিয়া পূজা করিবার পদ্ধতি প্রচারিত আছে, এই ত্রাটকযোগই তাহার মূল। ত্রাটকযোগে অধিকারিতালাভের জন্যই উক্ত প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল। পরন্তু তাহা এক্ষণে বিপরীত অর্থে পরিণত হইয়াছে। স্বর্ণরৌপ্যরেখাদি সমন্বিত শালগ্রামশিলা, বাণলিঙ্গ, অষ্টধাতুনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি, স্ফটিকনির্ম্মিত ও স্বর্ণরৌপ্য-নির্ম্মিত ত্রিকোণযন্ত্র, চতুষ্কোণ ও ষট্‌কোণ যন্ত্র প্রভৃতি

করিবেক। অনন্তর ক্রমে যখন চত্বরে আত্ম-প্রতীক দৃষ্ট হইবে, তখন তাহা আকাশেও দৃষ্ট হইবে (?)। এই প্রক্রিয়ায় সিদ্ধ হইলে যোগী গগনচর সিদ্ধপুরুষদিগকেও দেখিতে পান (?)।

চাক্ষুষীবিদ্যালাভের জন্য এইরূপ অনেক সুপন্থা আছে। পরন্তু সে সকল পন্থা অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ও দুষ্প্রচার আছে। এই বিদ্যায় অধিকারী হইবার জন্য, সদাসর্ব্বদা অভ্যাসের জন্য, অপর কতকগুলি এরূপ সুগম প্রক্রিয়ার উপদেশ আছে—যাহা সকল লোকেই সহজে (অক্লেশে) আয়ত্ত করিতে পারে। পরন্তু সে সকল প্রক্রিয়া কেবল ত্রাটকবিদ্যালাভের উপায় নহে, মনঃস্থৈর্য্যেরও উপায় বটে। প্রক্রিয়াগুলি এইঃ—সদা সর্ব্বদা নাসাগ্রদর্শন, ভ্রূমধ্যদর্শন ও দেবচক্ষু করিয়া ললাটবিন্দু-দর্শন। যথা—

"নাসাগ্রং দৃশ্যতে যেন পদ্মাসনগতেন বৈ।
মনসোমরণং তস্য খেচরত্বং প্রসিধ্যতি॥"

"ভ্রুবোরন্তর্গতা দৃষ্টিঃ * * *॥" ইত্যাদি।

যোগী পদ্মাসনে উপবিষ্ট ও তন্মনা হইয়া নাসাগ্রমাত্র দর্শন করিবেন। করিতে করিতে ক্রমেই তাঁহার মনের মরণ অর্থাৎ মনোবৃত্তির লয় বা অনুত্থান হইবে এবং খেচরী-বিদ্যায় পটুতা জন্মিবে *।

দৃষ্টি যদি ভ্রূদ্বয়ের অন্তরস্থ বিন্দুকেন্দ্রে আবদ্ধ হয় ত শীঘ্রই ত্রাটকসিদ্ধি ও সমাধি জন্মে।

এই ভারতবর্ষে এক সময়ে এই উচ্চতম যোগবিদ্যার এমন প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে, গৃহে গৃহে স্ত্রীলোকেরাও এই বিদ্যায় পারদর্শিনী হইত। মহাভারতে একটী আখ্যায়িকা আছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, সুলভা নাম্নী জনৈক রমণী যোগবিদ্যায় এরূপ অভিজ্ঞা ছিলেন যে, তৎকালের প্রধান যোগী জনকরাজাকেও তিনি যোগবলে অভিভূত করিয়াছিলেন। যথা—

"সুলভা ভস্য ধর্ম্মেষু মুক্তোনেতি সসংশয়া।
সত্ত্বং সঙ্গেন যোগজ্ঞা প্রবিবেশ মহীপতেঃ॥
নেত্রাভ্যাং নেত্রযোরস্য বশ্মীন্ সংযম্য রশ্মিভিঃ
সা চ সঞ্চোদয়িষ্যন্তী যোগবর্ত্মৈর্ব্বব্রন্ধ হ॥"

যোগিনী সুলভা শুনিলেন যে, রাজর্ষি জনক মুক্তপুরুষ ও পরমযোগী। তিনি তাঁহার মুক্ততা পরীক্ষা করিবার জন্য মিথিলা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি আপনার বুদ্ধিসত্ত্বের দ্বারা রাজার বুদ্ধিসত্ত্বে (অন্তঃকরণমধ্যে) প্রবেশ করিলেন। কিরূপে তিনি আপনার আত্মাকে রাজার অন্তরে প্রবিষ্ট করাইলেন? ইহা উহার পরশ্লোকেই

সম্মুখে রাখিয়া আমরা প্রত্যহই পূজা করি, পরন্তু উদ্দেশ্যজ্ঞান না থাকাতেই আমরা তাহার ফলভাগী হই না। আজন্মকাল শালগ্রাম পূজা করিয়াও আমরা ত্রাটকফলে বঞ্চিত হই, ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে।

* ত্রাটক যোগে অধিকারী হইবার জন্যই সদা-সর্ব্বদা নাসাগ্র, ভ্রূমধ্য ও ললাটকেন্দ্র দর্শন করিতে হইবে। এই মহান্ সাধনাকে সুগম করিবার জন্য ঋষিরা কেহ ভ্রূমধ্যে, কেহ বা ললাটমধ্যে তিলক ধারণ করিতেন। অভিপ্রায় এই যে, সেই সেই স্থানে কোন একটা চিহ্নবিন্যাস করিলে দৃষ্টি তাহাতে সহজে আবদ্ধ করা যায়। এতদ্বিধ অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্যই ঋষিরা তিলকধারণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণকার ভট্টাচার্য্যমহাশয়েরা সে উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া "স্নানের সাক্ষী ফোটা" করিয়া তুলিয়াছেন। বৈষ্ণবী রমণীরা যে নাসাগ্রে রসকলি তিলক পরেন, ভাবিয়া দেখিলে, তাহাই উত্তম অবলম্বন। তাহাই নাসাগ্র-দর্শন-সাধনার প্রকৃত উপায়। পরন্তু তাহা এক্ষণে সংযোগের প্রধান বা উচ্চতম অনুকরণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

ব্যক্ত আছে। অর্থাৎ তিনি আপনার চক্ষুর্দ্বয়কে রাজার চক্ষুর্দ্বয়ের অভিমুখে ঠিক্ সমসূত্রপাতক্রমে স্থাপিত করিয়া এবং আপনার নেত্ররশ্মির দ্বারা রাজার নেত্ররশ্মি সংযত করিয়া, তাঁহার আত্মাকে যোগরূপবন্ধনে বদ্ধ করিলেন। রাজাও সেই সুলভার অদ্ভুত কার্য্যদর্শনে বিস্মিত হইয়া, ইনি আমাকে কি জন্য বাঁধিতেছেন?—ইহা জানিতে ইচ্ছা করিলেন।

যোগিনী সুলভা রাজর্ষি জনককে যাহা করিতেছিলেন, তথায় কোন ইংরাজ দর্শক থাকিলে বলিতেন যে, সুলভা রাজাকে (Mesmerise) মিস্‌মেরাইজ্ করিতেছে। যাহাই হউক, এখনকার মিস্‌মেরিজম্ সুলভার সেই কার্য্যের ছায়ার স্বরূপ হইলেও হইতে পারে।

ভাল এক প্রসঙ্গাগত কথায় প্রস্তাবিত কথা ভুলিয়া গেলাম। সে সকল কথা কোথায় বা কোন প্রান্তে পড়িয়া আছে তাহার ঠিকানাও নাই। যাহাই হউক এক্ষণে পুনর্ব্বার প্রস্তাবিত বিষয় উত্থাপিত করা যাউক।

"সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা,
বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন চ চক্ষুঃপীড়নে,
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ॥"

সমাধিলিপ্সু যোগী জনশূন্য, বায়ুশূন্য ও উপদ্রবশূন্য মনোরম প্রদেশে বাসকরতঃ স্বীয় অভীষ্টসাধনে নিবিষ্ট থাকিবেন। যে স্থানে কোন অপ্রীতিকর বা মনশ্চাঞ্চল্যজনক উপদ্রব বর্ত্তমান থাকে—অথবা কোন উৎকট শব্দাদি শুনিবার সম্ভাবনা থাকে—যোগী তাদৃশ স্থলে বাস করিবেন না। অপক্বনিদ্রাবস্থায় হঠাৎ কোন উৎকট ধ্বনি কর্ণপ্রবিষ্ট হইলে, কি শরীরে কোন বেদনাদায়কবস্তু স্পৃষ্ট হইলে সহসা নিদ্রাচ্ছেদ হওয়ায় যেমন শরীরের ও মনের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, সেইরূপ অপক্ব সমাধি-অবস্থাতেও হঠাৎ কোন উৎপাত ঘটনা হইলেও মনের একাগ্রতা ভাঙ্গিয়া যায়, এবং তজ্জনিত মনের চমক্ ও তাহা হইতে বিবিধ মানসব্যাধি উৎপন্ন হয়। অতএব যোগসাধনকালে নির্জ্জন গিরিগুহা ও উপদ্রবশূন্য নিবিড় অরণ্য আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য। গিরিগহ্বরে ও ভূবিবরে বাস করিলে প্রকারান্তরে সর্পাদিজাতির বিবরবাসের অনুকরণ করাও হয়? ঐ সকল প্রাণী যেমন শীতসময়ে গর্ত্তপ্রবেশপূর্ব্বক অনাহারে কালযাপন করে, যোগীরাও তদ্রূপ গিরিগহ্বরে ও নিবিড় নিকুঞ্জোদরে প্রবেশপূর্ব্বক সমাহিত হইয়া থাকেন। এরূপ শুনা গিয়াছে যে, অনেক বুজরুক্ মুসলমান ফকীর গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে অতি যৎসামান্য আহার অবলম্বন করিয়া মাসাধিক কাল বাস করিয়াছেন। বিবর-বাসের অন্যবিধ উদ্দেশ্যও আছে। তাঁহাদের মনোভাব এই যে, বাহিরের বায়ু সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। তন্নিবন্ধন তাহার উষ্ণতাদিও ন্যূনাধিক হয়। বায়ুর পরিবর্ত্তন ও তাহার সেই ন্যূনাধিকগুরুত্বাদির দ্বারা শরীরেরও পরিবর্ত্তন বা অবস্থান্তর হয়। সেইজন্য, শরীরকে অপেক্ষাকৃত স্থিরতর রাখিবার জন্য, যে স্থানে বায়ুর পরিবর্ত্তন বা তাহার রূপান্তর অতি অল্প পরিমাণে হয়, যোগিদিগের তাদৃশ স্থান আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য। তাদৃশ স্থানই জড় অবস্থায় বাস করিবার বিশেষ উপযোগী। গর্ত্তে বা গিরিগহ্বরে বাস করিলে যদিও শরীরের তত্ত্ব কিছু বিকৃত হইবার সম্ভাবনা,—নির্ম্মল ও বহমান বায়ু সেবন না করিলে যদিও পীড়া হইবার

সম্ভাবনা আছে,—কিন্তু সে সম্ভাবনা কুম্ভক অর্থাৎ দৈহিক বায়ুর বেগধারণপূর্ব্বক সমাহিত বা বাহ্যজ্ঞানবর্জ্জিত অবস্থায় আছে কি না সন্দেহ। চিকিৎসকদিগের নির্ণীত উক্ত নিয়ম বোধ হয়, সমাধি-অবস্থায় খাটে না। চিত্তের দৃঢ় একাগ্রতাই তাঁহাদের শরীরকে তখন অবিকৃত রাখে।

বায়ুর বেগধারণই যে সমাধির বা বাহ্যসংজ্ঞা-বিলোপের প্রধান কারণ, তাহা আধুনিক ডাক্তারগণের মত অবলম্বন করিলেও সপ্রমাণ করা যায়। ডাক্তারেরা বলেন যে, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বারংবার নিঃশ্বসিত বায়ু সেবন করিলে লোকের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। ডাক্তারদিগের এই মত যদি সত্য হয় ত যোগিদিগের "বার বার রেচক, পূরক ও কুম্ভক করিলে সমাধি জন্মে" এ মত সত্য না হইবে কেন? ইংরাজ ডাক্তারেরা বলেন যে, বায়ু যতই ফুসফুস্ হইতে বহির্গত হয়—ততই তাহাতে (Nitrogen) ক্ষারযানের আধিক্য হয়। কোন কোন ডাক্তার নাকি দেখিয়াছেন, উপর্য্যুপরি বারবার ও ঘনঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলে, প্রতিবারের নিঃশ্বসিত বায়ুতে শতকরা এক ভাগ করিয়া ক্ষারযানের বৃদ্ধি হয়। অন্য এক সাহেব ডাক্তার বলিয়াছেন যে, যে সকল প্রাণীর দেহে উষ্ণশোণিত প্রবাহিত হয়—তাহাদিগকে যদি গবাক্ষবর্জ্জিত প্রকোষ্ঠমধ্যে আবদ্ধ রাখা যায়, তাহা হইলে, যখন তত্রস্থ বায়ুতে শতকরা ১০ কি ১১ ভাগ ক্ষারযান জন্মিবে তখন আর তাহাদের চৈতন্য থাকিবে না; নিশ্চয়ই তাহারা তখন অচৈতন্য হইয়া পড়িবে। ইংরাজদিগের বর্ণিত নিঃশ্বসিত বায়ুর পুনঃ পুনঃ সেবন যদি চৈতন্যহরণের বা বাহ্যজ্ঞান বিলোপের কারণ হয় ত যোগিদিগের বর্ণিত রেচক পূরক ও কুম্ভক নামক প্রাণায়াম ক্রিয়াটী সমাধিলাভের কারণ না হইবে কেন?

আরও দেখা যায় যে, যে সকল জীবের শ্বাসক্রিয়া ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয়,—তাহাদের দৈহিক সন্তাপ অতি অল্প। যাহারা ঘনঘন নিশ্বাস ছাড়ে,—তাহাদের দৈহিক উষ্ণতা কিছু অধিক। জীবসকল আত্ম শরীরের তাপ পরিমাণের অল্পাধিক্য-অনুসারে ক্ষুৎপিপাসাকুল হইয়া থাকে। শিশুগণ ঘনঘন শ্বাসপ্রশ্বাস নির্বাহ করে বলিয়া তাহাদের দেহের তাপপরিমাণ কিছু অধিক। তজ্জন্যই তাহারা ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করিতে অক্ষম। যুবকদিগের শ্বাসসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প, তন্নিবন্ধন তাঁহাদের দৈহিকতাপও অল্প,—সুতরাং তাঁহারা কিছু অধিক সহিষ্ণু। পক্ষিজাতির দৈহিক সন্তাপ প্রায় ১০৬ হইতে ১০৯। সেই জন্যই তাহারা দুই তিন দিনের অধিক ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না। সর্পজাতির দেহ পক্ষিজাতির দেহের ন্যায় সন্তপ্ত নহে। সেই কারণে তাহাদের নিকট অল্পপরিমিত (Oxygen) অম্লযান বায়ুই যথেষ্ট। এবং সেই কারণেই তাহারা তিন চারি মাস আহার না করিয়াও থাকিতে পারে।* প্রাণায়ামপরায়ণ যোগিদিগেরও দৈহিক সন্তাপ অল্প,—সুতরাং তাঁহারাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহিষ্ণু। এমন কি তাঁহারা সর্পজাতির ন্যায় দীর্ঘকাল পানভোজন ও নির্ম্মলবায়ুসেবন না করিয়াও জীবিত ও বিনা-উদ্বেগে গিরিবিবরে ধ্যাননিমীলিতনেত্রে থাকিতে পারেন।

* "ফণিনঃ পবনাশনাঃ।" প্রসিদ্ধি আছে যে, সর্পেরা বায়ুমাত্র ভোজন করিয়া অনেক দিন জীবিত থাকিতে পারে।

ব্রাহ্মণেরা যে আযতস্বরে প্রাণবোচ্চাবণ কবিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদেব প্রাণাযাম-শিক্ষার বিশেষ উপযোগী। প্রণব যদি বিহিত নিয়মে বাব বার উচ্চারিত হয ত তৎসঙ্গে কিছু না কিছু প্রাণসংযম হইবেই হইবে। অর্থাৎ যে সমযেব মধ্যে তাঁহাদেব অন্যূন তিন বাব নিঃশ্বাস হইত—বিহিতক্রমে প্রণবোচ্চাবণ কবিলে সেই সমযেব মধ্যে তাঁহাদের একটীব অধিক নিঃশ্বাস হইতে পাবে না। মনঃসংযোগপূর্ব্বক প্রণবোচ্চাবণ কবিলে তাহা যেমন প্রাণাযামেব সাহায্যকাবী হয, তেমনি অন্যান্য উপকাবও সাধিত হয। কি উপকাব হয? তাহা একটু অনুসন্ধান কবিলেই জানা যায। মনঃসংযোগপূর্ব্বক দীর্ঘস্বর-বিশিষ্ট প্রণবাদি অল্পাক্ষব শব্দেব উচ্চাবণ যে শবীবের উপব কিরূপ কার্য্য কবে, কিরূপ শক্তি বা ক্ষমতা বিস্তাব কবে, তাহা অতীব দুর্বোধ্য। অনুসন্ধান কবিযা দেখিলে তাহার যৎকিঞ্চিন্মাত্র লৌকিক ফল দেখা যায। সে ফলটীও প্রায় সমাধিব অনুরূপ অর্থাৎ সুষুপ্তি বা নিঃস্বপ্ননিদ্রাব তুল্য। মানসিক উদ্বিগ্নতাহেতু রাত্রে যাঁহাদেব শীঘ্র নিদ্রাকর্ষণ হয না,—তাঁহারা পবীক্ষা করিযা দেখিবেন যে, একমনে দীর্ঘস্ববিশিষ্ট ওঁ অথবা হ্রীঁ প্রভৃতি শব্দ এক মনে অন্যূন ৫০০ বার স্মরণ করিলে অত্যুত্তম তৃপ্তিজনক নিদ্রার আবির্ভাব হয় কি না। উচ্চারণকালে চিত্তকে প্রশান্তভাবে নিমগ্ন অথবা কোন এক তৃপ্তিকর বিষয়ে নিবিষ্ট রাখিবে; কদাচ চঞ্চল হইতে দিবে না। তাহা হইলে ক্রমে উত্তম নিদ্রার আবির্ভাব হইবে।*

* "নমস্কৃত্যাব্যয়ং বিষ্ণুং সমাধিস্থঃ স্বপেন্নিশি।
জন্মনিষ্ঠমনুং শান্তঃ সুখসুপ্ত্যা শতাধিকম্॥"
গর্গ।

উত্তম নিদ্রা হইবাব কারণ এই যে, স্নাযবিক উত্তেজনায় শরীব ও মন ম্লান হইলে উক্তবিধশব্দের অনুধ্যানদ্বাবা স্নাযবিক উগ্রতার শান্তি হয। এই সকল নিগূঢ়তত্ত্ব-অনুসন্ধানদ্বাবা স্থিবীকৃত হয যে, একমনে প্রণব কি অন্য কোন মন্ত্র উচ্চারণ করিতে কবিতে ক্রমে স্নাযবিক উগ্রতা উপশান্ত হইয়া অবশেষে উৎকৃষ্ট নিদ্রার অনুরূপ অত্যুত্তম সমাধিও আবির্ভূত হয। ওঁ হ্রীঁ প্রভৃতি ঈশ্বরবোধক শব্দ ভিন্ন অন্য কোন নিরর্থক শব্দের উক্তবিধ শক্তি আছে কি না তাহা আমরা জ্ঞাত নহি, পবন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, যোগিগণ যোগসাধনকালে অনির্ব্বচনীয়শক্তিপূর্ণ ঈশ্বববোধকশব্দ ভিন্ন অন্য কোন নিবর্থক শব্দ অবলম্বন বা উচ্চাবণ করেন না। মন্ত্রজপেব চবমে অত্যুত্তম সমাধি জন্মে, ইহা দেখিযাই যোগীবা মন্ত্রজপকে যোগের অন্যতম পথ বলিযা বর্ণন কবিয়াছেন। এই মন্ত্র যোগেব বিষয ও পদ্ধতি আমরা প্রস্তাবান্তরে বর্ণন কবিব।†

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আদিম মনুষ্যেবা নিসর্গেব বা প্রকৃতির অনুকবণ করিযাই যোগী হইতেন সর্পাদিজাতির হৈমন্তিক জড়তা ও অনশন প্রভৃতি অনেকানেক দুষ্কর কার্য্য কখন কখন মানবদিগেরও ঘটিযা থাকে। পবন্তু অজ্ঞ লোকেবা অনবধানতাবশতঃ

† পূর্ব্বকালেব ব্রাহ্মণেবা রোগশোক-নিবারণের জন্য যে বিবিধ শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি (মন্ত্রজপ ও চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি) করিতেন, ভাবিযা দেখিলে, সে সকল কার্য্য অযুক্ত বা অমূলক বলিয়া বোধ হয না। পরন্তু সে সমুদায়ই এতন্মূলক বলিয়াই প্রতীত হইবে। একমনে মন্ত্রোচ্চারণ ও মন্ত্রার্থস্মরণ করিতে করিতে যদি স্নাযবিক উগ্রতার শান্তি হয ত তৎক্রমে স্নাযবিক পরিবর্ত্তন ও তদ্ঘটিত রোগাদি প্রশমিত না হইবে কেন!

তাহার কারণ অনুধাবন করিতে পারে না। অনেক প্রাকৃত মানব কিছুমাত্র প্রকৃতিতত্ত্ব জানে না—অথচ তাহারা এরূপ অনেক কার্য্য করে—যাহার সঙ্গে যোগের কোন কোন অঙ্গের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। ভানুমতীর বাজী তাহার অন্যতর নিদর্শন। ভানুমতীর বাজীকে আমরা সমাধির অনুকরণ বলিলেও বলিতে পারি। কেন না সেই কার্য্য দেখাইবার পূর্ব্বে তাহাকে কুম্ভক করিতে হয় ও তদ্দ্বারা আপনার বাহ্যচৈতন্য বিলুপ্ত করিতে হয়। শরীরের মধ্যে বায়ুপুঞ্জ আবদ্ধ থাকাতে তাহার শরীর যখন নিতান্ত লঘু হইয়া পড়ে, তখন সে একগাছী যষ্টিমাত্র অবলম্বন করিয়া শূন্যোপরি যোগাসনে উপবিষ্ট থাকিতে পারে। ক্রমে তাহার অবলম্বিত যষ্টিগাছিকে ধীরে ধীরে সরাইয়া লইলেও, সে সাগরবক্ষে ভাসমান তরণির ও তূলরাশির ন্যায় শূন্যোপরি বায়ুসমুদ্রে ভাসিতে পারে। এই কার্য্যে পটুতা লাভ করিতে হইলে, শৈশবকালেই উহার শিক্ষা আরম্ভ করিতে হয়। বয়স অধিক হইলে ঐ কার্য্য অতি দুষ্কর হইয়া দাঁড়ায়। সেই জন্যই ভোজবাজীব্যবসায়ীরা আপন আপন কন্যাদিগকে উক্তবিদ্যা শিখাইবার নিমিত্ত অতি শৈশবকালেই তাহাদিগকে প্রথমতঃ জলমগ্ন হইতে শিখায়। শিক্ষার সময় দুগ্ধ, ঘৃত, মাংসের যূষ ও কোমল অন্নমণ্ড প্রভৃতি সুপথ্য প্রদান করে। ক্রমে জলমগ্ন থাকা যখন অভ্যস্ত হয়—যখন তাহারা অন্যূন অর্দ্ধদণ্ডকাল জলমগ্ন থাকিতে কিছুমাত্র ক্লেশবোধ করে না,—তখন তাহাদিগকে স্থলে বালুকারাশির উপর বদ্ধপদ্মাসনে উপবিষ্ট করাইয়া কুম্ভক করিতে শিখায়। কুম্ভকাভ্যাস সুদৃঢ় হইলে ক্রমে তাহার নিম্নস্থ বালুকারাশি অল্পে অল্পে (নিঃসাড়ে) সরাইয়া লয়। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ক্রমে তাহাদের নিরবলম্ব হইয়া শূন্যোপরি যোগাসনে বসিবার শক্তি জন্মে। বাজীকরদিগের এই যৎসামান্য কুম্ভকাভ্যাস অপেক্ষা যোগিদিগের কুম্ভকাভ্যাস অতীব গুরুতর ও অসাধারণ ফলপ্রদ জানিবেন। (ক্রমশঃ)।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

বঙ্গীয় প্রাচীন কবি এবং কাব্য।

কবি এই শব্দের নিগূঢ় অর্থ ও তাৎপর্য্য অতি গভীর। যাঁহারা সহৃদয় ও কাব্যামোদী তাঁহারাই কেবল 'কবি' শব্দের মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ। দার্শনিকগণ ও বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ কাব্যরসাস্বাদনে সমর্থ কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না। কবিত্ব লাভ করা বড় সৌভাগ্যের কার্য্য। মহাত্মা বেদব্যাস অগ্নিপুরাণে বলিয়াছেন,

"নরত্বং দুর্ল্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্ল্লভা।
কবিত্বং দুর্ল্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্ল্লভা॥"

অর্থাৎ পৃথিবীতে মনুষ্যজন্ম লাভ করা অত্যন্ত দুর্ল্লভ এবং বিদ্যালাভ আরও দুর্ল্লভ। পরিশ্রম করিলে লোকের বিদ্যালাভ হইতে পারে, কিন্তু কবিত্বলাভ অত্যন্ত সুদুর্ল্লভ এবং সৌভাগ্যক্রমে কবিত্বলাভ হইলেও তাহাতে শক্তি জন্মান বড়ই সুকঠিন।

স্বাভাবিক কবি মনুষ্যের শোকতাপ সমস্তই দূর করিতে পারেন এবং ইন্দ্রজালের ন্যায় লোকের অন্তঃকরণের বৃত্তি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতেও সমর্থ হন।

বঙ্গীয় কবিকুলের মধ্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্র জনসমাজে পরিচিত ও অত্যন্ত আদরণীয়, কিন্তু অদ্বৈতমঙ্গল নামক মহাকাব্যপ্রণেতা আচার্য্য হরিচরণদাসের মহাকাব্যখানি দুষ্প্রাপ্য বলিয়া এই স্বাভাবিক কবি লোকসমাজে তাদৃশ পরিচিত নহেন। প্রায় ৪০০ শত বৎসর অতীত হইল এই মহাকবি অদ্বৈতমঙ্গল প্রণয়ন করিয়াছেন।

এই কাব্য এমনই চমৎকার ও ভক্তিরসে পূর্ণ যে পাঠ করিবামাত্রই স্পষ্ট বোধ হইবে যে কবিবর প্রেমভক্তিতে আপ্লুত হইয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। মনের মধ্যে অকৃত্রিম প্রেমভক্তির উদয় না হইলে কখনই এমন সরল শব্দে ও স্বাভাবিক গুণালঙ্কারে ভূষিত করিয়া কাব্য গ্রন্থন করা যাইতে পারে না।

এই মহাত্মা চৈতন্য ও অদ্বৈত আচার্য্যের সমসাময়িক লোক। অদ্বৈত আচার্য্য যখন শান্তিপুরে আগমন করিয়া গঙ্গাতীরে তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন তখন এই মহাকবি তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার দ্বারা দীক্ষিত হন।

এই মহাত্মা স্বীয় কাব্যের মধ্যে যে সকল শব্দ বিন্যাস করিয়াছেন, ঐ সকল শব্দ যেমন মধুর, সেইরূপ আড়ম্বরশূন্য। কাব্যমধ্যে এইরূপ শব্দবিন্যাস করাই অতি প্রশংসার বিষয়।

সহৃদয়শিরোমণি দণ্ডীস্বামী আড়ম্বরশূন্য স্বাভাবিক কবিদিগের কাব্যরচনা দেখিয়া, কবিপ্রবন্ধের ঔৎকর্ষরক্ষার নিমিত্ত 'কাব্যাদর্শ' নামক অলঙ্কারের সৃষ্টি করেন এবং তাহার প্রথমেই এই কবিতাটী লিখিয়াছেন যথা—

"গৌর্গৌঃকামদুঘা সম্যক্
প্রযুক্তাস্মর্য্যতে বুধৈঃ।
দুষ্প্রযুক্তাপুনর্গোত্বং
প্রয়োক্তুঃ সৈব শংসতি॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কবিবাণী যদি সুন্দররূপে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহা কামধেনুর ন্যায় সর্ব্বকামপ্রসবিনী হইয়া থাকে, আর যদি সমীচীনরূপে প্রযুক্ত না হয়, তাহা হইলে প্রয়োগকর্ত্তার গোত্বপ্রকাশ করিয়া থাকে। এবিষয় যে কেবল দণ্ডীস্বামী লিখিয়াছেন তাহা নহে, শ্রুতিতেও ইহার প্রমাণ আছে, যথা—

"একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যক্ জ্ঞাতঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুগ্ভবতীতি।"

সুকবির কাব্যে ঔৎকর্ষসাধনের জন্য মহাত্মা সম্মট ভট্ট 'কাব্য প্রকাশের' প্রথমেই লিখিয়াছেন—

"কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতর ক্ষতয়ে" ইত্যাদি।

অন্তঃকরণের যথার্থ ভাববিনির্গমক সুকবির কাব্য, তাহার যশঃ, অর্থ ও ব্যবহারজ্ঞান সমস্তই উৎপাদন করিয়া থাকে।

যে দেশীয় কবিই হউন না কেন স্বাভাবিক ও ছলরহিত কবি সকল দেশেরই সমান। এই কারণে কি পারস্য, কি ইউরোপ, কি ভারতবর্ষ, প্রায় সর্ব্বদেশীয় প্রাচীন কবিগণের সুমধুর কাব্য পাঠ করিয়া নব্য সম্প্রদায় বিমোহিত হন। ইউরোপের মধ্যে মহাত্মা সেক্সপিয়র, মিল্টন্, হোমর, বাইবন ও দান্তে; ভারতবর্ষে বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস, ও ভবভূতি; পারস্যদেশে হাফেজ, যামী ও সাদী এবং বঙ্গদেশে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, হরিচরণ দাস, কবিকঙ্কণ, ও ভারতচন্দ্র প্রসিদ্ধ কবি।

এই সকল কবি যখন যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাই স্বাভাবিক ও রসভাবে পূর্ণ। মহোদয় বিদ্যাপতির কবিতা এমনি রসভাবে পূর্ণ ও শব্দালঙ্কারে বিভূষিত যে তাঁহার যে কবিতা যখন পাঠ করা যায়,তখনই সে কবিতা স্বর্গসুখ বিতরণ করিতে থাকে।

প্রবাদ আছে যে গৌড়াধিপতি রাজা শিবসিংহের দুহিতা লছিমাদেবীকে না দেখিলে বিদ্যাপতি কাব্য রচনা করিতে পারিতেন না। একদিন গৌড়েশ্বর লছিমাকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া বিদ্যাপতিকে কহিলেন 'বিদ্যাপতি. তুমি এই সময়ে একটী কবিতা রচনা করিয়া দাও'। এই বাক্য শ্রবণমাত্রই বিদ্যাপতি প্রাসাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু যাহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসেন সে লছিমাকে দেখিতে পাইলেন না, সুতরাং কবিতা রচনা করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অনন্তর গোধূলি সময়ে রাজা লছিমাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলে, লছিমা অবিলম্বে একটী প্রদীপ হস্তে করিয়া, সেই অট্টালিকার একটী গবাক্ষে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কবিবর বিদ্যাপতি সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই দেখিলেন যে, লছিমা আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; অমনি কবিশিরোমণি কোহিনুরসোদরস্বরূপ এই কবিতা প্রস্তুত করিলেন—

যব গোধূলি সময় বেলি
ধনী মন্দির বাহির ভেলি,
নব জলধরে বিজরীর রেহা
দ্বন্দ্ব পশারিয়া গেলি॥
ধনী অলপবয়সী বালা,
যেন গাঁথনি পুহপমালা,
থোরি দরশনে আশা না পূরল,
বাঢ়ল দ্বিগুণ জ্বালা।
গোরী কলেবর নূনা
জনু আঁচরে উজর সোণা,
কেশরী জিনিয়া মাঝারি বলনী
দুলহ লোচন কোণা॥
ধনী ঈষৎ হাসনি সনে
মুঝে হানল নয়ন-বাণে।
চিরজীব রহু পঞ্চগৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভণে॥

পাঠক! বিদ্যাপতিসম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিবার নাই, তুমি যদি সহৃদয় সামাজিক হও, তাহা হইলে এই কবিতার মূল্য আছে কি না এবং ইহা কোহিনুর অপেক্ষা মূল্যবান্ কি না, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে।

অনেক কবির কবিত্বশক্তি যথেষ্ট আছে, কিন্তু বাগ্বিন্যাসের শক্তি অতি অল্প। একাধারে উভয়বিধ শক্তির সমাবেশ বড়ই দুর্লভ। বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে এই দুই শক্তি কেবল বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস ও অদ্বৈতমঙ্গল-প্রণেতা হরিচরণদাসের যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, এমন আর কাহারও দেখা যায় না।

যদি কেহ বলেন যে শব্দছটার প্রয়োজন কি? কেবল ভাবগুম্ফন হইলেই কাব্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। আমরা ইহা স্বীকার করিতে পারি না। আমরা বলি যে, ভাবের সহিত শব্দছটা থাকিলে কাব্যের যেরূপ সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়, কেবল ভাবে তেমন হয় না।

এই বিষয় বিচার করিয়া চৈতন্যের সমসাময়িক কবি কবিকর্ণপুরগোস্বামী তাঁহার 'আনন্দ বৃন্দাবন চম্পু' নামক গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন—

"যথাতথাস্তুঃ কুসুমানি মালা
চিত্রায়তে গুম্ফনকৌশলেন।

তত্রাপি চেত্তানি সুসৌরভানি
ভবন্তি বম্যানি তদা পুনঃ কিং ॥"

অর্থাৎ কুসুম যেরূপই হউক না কেন, গাঁথিবার কৌশলেই মালা মনোহারিণী হইয়া থাকে, আর যদি ঐ সকল কুসুম সৌরভযুক্ত হয়, তাহা হইলে যে, সেই মালা সমধিক মনোহারিণী হয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

মহারাজবিক্রমাদিত্য একদিন সম্মুখে একটী বজ্রাহত শুষ্ক বৃক্ষ দেখিয়া ঘটকর্পর ও কালিদাস উভয়কেই জিজ্ঞাসা করিলেন—সম্মুখে এটী কি রহিয়াছে ? তাহাতে ঘটকর্পর প্রথমে বিদ্যুন্মালাছন্দে বলিলেন—

"শুষ্কোবৃক্ষস্তিষ্ঠত্যগ্রে।"

এই বাক্য শ্রবণমাত্র রাজা কালিদাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মহাকবি কালিদাস বলিলেন—

"নীরসতরুরিহ পুরতো ভাতি।"

পাঠক। এখন আপনার হস্তে বিচার, আপনি বিচার করিয়া দেখুন একটী বিষয় এই দুই কবির মুখ হইতে কিরূপে বিনির্গত হইল। অতএব কবিতার সঙ্গে শব্দছটারও নিতান্ত আবশ্যক।

বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস ও ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিদিগের বিরচিত কাব্য অনেকেই পাঠ করিয়া তাহার রসাস্বাদন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা বোধ করি যে, হরিচরণদাসপ্রণীত 'অদ্বৈতমঙ্গল নামক' মহাকাব্য অনেকেই পাঠ করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থ সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এজন্য এই মহাকবির আশ্চর্য্য কবিত্বশক্তি লোকে তত বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই।

অগ্নি, তৃণমধ্যে থাকিয়া যেরূপ শৈত্যগুণ আশ্রয় করিয়া থাকে না, একদিন না এক দিন প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ এই মহাকবিপ্রণীত 'অদ্বৈতমঙ্গল' নামক দ্বাবিংশ-সর্গাত্মক মহাকাব্য, একদিন না একদিন দেশমধ্যে বিস্তৃত হইবেই হইবে। যদি কোন মহাত্মা এই মহাকাব্যের সমগ্রভাগ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন, তাহা হইলে সাহিত্যসমাজ যে তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রায় ৪০০ শত বৎসর অতীত হইল এই মহাকবি বরেন্দ্রভূমিতে জন্মপরিগ্রহ করেন। ইনি মহাত্মা অদ্বৈত আচার্য্যের সমসাময়িক লোক। যখন অদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীহট্টের রাজা দিব্যসিংহের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া দেশপরিত্যাগপূর্ব্বক পিতামাতার সহিত শান্তিপুরে গঙ্গার উপকূলভাগে বাস করেন, সেই সময়ে এই মহাকবি হরিচরণদাস তাঁহার নিকটে আসিয়া একত্র বাস করিতে লাগিলেন।

তৎপরে আচার্য্যের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া, এই মহাকবি 'অদ্বৈতমঙ্গল নামক' মহাকাব্যের রচনা করেন। ইহাতে চৈতন্য ও নিত্যানন্দের জীবনী সহ আচার্য্যের চরিত অতি সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা কোন রাজবাড়ীর প্রসিদ্ধ প্রাচীন পুস্তকালয়ে এই মহাকাব্যের কিয়দংশ প্রাপ্ত হইয়াছি, পাঠকদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত এই স্থানে তাহার কোন কোন অংশ তুলিয়া দিলাম। কবিতাগুলি কেমন রসভাবে পূর্ণ ও কিরূপ মধুর শব্দে গুম্ফিত তাহা সহৃদয় পাঠকগণ অনুভব করুন:—

দানলীলানুকরণ।

(ত্রিপদী।)

"প্রিয়সখি!
এপথে বসিলা দানী কবে?
এখনি পশরা কেড়ে লবে।
এমত জানিব যদি, দবে বসি বেচি দধি;
কিবা কার্য্য মথুরার মাঝ?
দধি টক হয়ে যাব, দুগ্ধ নট বড় দায়,
বিলম্বে নাহিক এবে কায়।
বিষম দানীর হাতে ঠেকাইলা তুমি তাতে
উচকুচে মাগে বহুদান।
পুষ্টনিতম্বিনী যেই দান দিবে বহু সেই
এই বলি ক্রমে দানী হয় আগুয়ান।
ভেড়ছ নয়নে চাহে, হাসি মুখে কথা কহে,
কি আছে ইহার মনে জানি?
দানী হলে দূরে রয়, এত কভু দানী নয়,
আঁচল ধরিয়া বহু করে টানানানি।
চারি কড়া পায় যাতে, দশগুণ বলে তাতে,
পশরাতে কহে যে দ্বিগুণী।
অবিচার এই বড়, দানী হয়ে কহে দড,
হিয়া করে দুরু দুরু এর কথা শুনি।
কাঁচলি-কষণ খুলি পড়িছে জঘনে ঝুলি,
তবু চাহে বঙ্কিম নয়নে।
আলু থালু কেশ পাশ, ঘন ঘন বহে শ্বাস,
তবু দানী চাহে দান হসিত বদনে।
হেসে হেসে কথা কয়, নারী বলি নাহি ভয়,
একেবারে পার নাহি করিবে সবারে।
হালি ধরি নিজ করে, একে একে পার করে
সঙ্গি সহ হাসি হাসি ভুলায় আমারে।"

পাঠকমহাশয়! এই মহাকাব্য যে কিরূপ সুন্দর ও রসভাবে পূর্ণ, তাহা এই অংশ পাঠ করিয়া অনুভব করুন।

এই দানলীলার অনুকরণ করিতে করিতে যে স্থানে প্রেমভক্তিতে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও চৈতন্যের অন্তর্দশা হইয়াছিল, সে স্থানের মাধুর্য্য অনুভব করিবার জন্য কিয়দংশ এই স্থানে তুলিয়া দিলাম:—

"তিন প্রভু একসঙ্গে প্রেম উথলিল।
প্রেমে অচেতন হয়ে জলেতে পড়িল।
ভক্তবৃন্দ উঠি তিন প্রভুরে লইয়া,
তীরেতে বসিলা গিয়া কোলেতে করিয়া।
শ্রীনিবাস, নরহরি আর শ্যামদাস,
মুরারি, মুকুন্দ আর বৈদ্য কৃষ্ণদাস,—
সকলে কীর্ত্তন করে গোকুলের দান।
দান ছলে প্রেম হৈল না হয় সমান।
তবে ত তিনের হৈল অর্দ্ধ-বাহ্য-দশা;
গলাগলি করি কাঁদে মুখে নাহি ভাষা।
চল দাদা যাই মোরা সেই বৃন্দাবন—
এই বলি তিন জনে করয়ে রোদন।
অকপট প্রেমে তিনে হৈল অচেতন।
জবাপুষ্পসম রক্ত হইল নয়ন,
পিচকিরি সম অশ্রু বহিতে লাগিলা;
অবধৌত নিত্যানন্দ উলঙ্গ হইলা।
স্বর্ণকান্তি মহাপ্রভু ভূমে গড়ি যায়,
আউলা থালু ভাব দেখি নরহরি ধায়।
প্রেম দেখি ফুলে ফুলে কাঁদে গৌরীদাস;
আইলা চঞ্চল হয়ে চৈতন্যের পাশ।"

আমরা ক্রমে ইহার আর আর অংশ প্রকাশ করিয়া সাধারণের সম্মুখে উপহারস্বরূপ উপস্থিত করিব। এমন স্বাভাবিক কবিতা যাঁহার লেখনী হইতে বাহির হইয়াছে, স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে তাঁহার হৃদয় যে পূর্ণ, একথা সহৃদয়-মাত্রেই স্বীকার করিবেন। কবিতা, স্বভাব ও হৃদয়ের প্রতিকৃতি। কোন মহাত্মা বলিয়াছেন কবিতায় মনুষ্যের মনকে "From nature up to nature's God"এর নিকট লইয়া যায়, একথা ধ্রুব নিশ্চয়। যাঁহারা প্রকৃত কবি, তাঁহারা—

"Find tongues in trees, books in the running brooks, Sermons in stones, and good in everything."

(ক্রমশঃ)।

শ্রীজয়গোপাল গোস্বামী।

নিদ্রিত যুবতী।

পর্ব্বতকাননে রাজার নন্দিনী
বহুকাল ধরি নিদ্রাতে মগন,
লাবণ্য-ছটায় হারা'যে দামিনী,
আছিল মায়ায় হয়ে অচেতন।

ষড়ঋতু তথা উপরি উপরি
কতবার, আহা, হ'য়ে বিরাজিত
তুলিয়াছে কত আনন্দলহরী,
পশু, পক্ষী, কীটে করি আমোদিত।

কিছু দিন পরে, প্রকৃতি নীরব,—
গন্ধবহ আর তেমনি করিয়া
করে না বহন পুষ্পের সৌরভ,
চারুলতাগুলি গেল শুকাইয়া,

সে বিজন ভূমি ঘোর অন্ধকারে
হইল আবৃত, দিবাকর কর
নারিল পশিতে সে বনমাঝারে;
বৃক্ষপত্র আর করে না মর্ম্মর

পবনের বেগে;—পুনঃ সে বেগেতে
হয় না অস্থির তরঙ্গিণী জল;
বসিয়া সেরূপে বিটপিশাখাতে
করে না সেরূপে পরাণ শীতল

বিহঙ্গমগণ স্বস্থানে গাহিয়া;
কুসুমসকল অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত,
রহিল সেরূপে, সেরূপে লাগিয়া
আছিল শাখায়,—রহিল মুদিত।

একটীও দল নাহিক খসিল,
যেরূপ আছিল, রহিল তেমন,
কিরূপে সে ভাব অন্তর্হিত হ'ল?
কোন্ মায়াবলে জাগিল রমণী?—

রাজপুত্র এক কতদিন পরে
আসিল তথায়, বিস্মিত হইয়া
সুন্দরী যুবতী কুসুম উপরে
দেখিল নিদ্রিত রয়েছে পড়িয়া।

পূর্ণশশী তবে গগনে হাসিল,
নীচে রাজকন্যা নিদ্রাঘোরে হাসে;
যুবকের(ও) মন আনন্দে পূরিল;
মলয় বহিল যুবতী-আবাসে।

কি এক অজ্ঞাত নিয়মে যুবক
হ'য়ে বশীভূত, কিছুক্ষণ পরে,
চুম্বিল তাহার রক্ত-বিম্বাধর
যুবতী জাগিয়া উঠিল শিহরে।

প্রকৃতির সেই জড়রূপ ভাব
হল অন্তর্হিত রাজপুত্রাগমে;
পূর্ব্বের মূরতি ধরিল স্বভাব,
সকল(ই) হাসিল যুবতী আশ্রমে।

লজ্জিত হইয়া ঈষৎ হাসিয়া,
যুবতী উঠিয়া বসিল তখন।

বুঝেছ কি তুমি, বুঝেছ সে মায়া?—
প্রেম সে যুবক, সে যুবতী মন।

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র।

পাপ্তগ্রন্থের সমালোচনা।

যদুবংশধ্বংস, পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক;—
শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত।

রাজকৃষ্ণ বাবুর লিখিত গ্রন্থ সমালোচনা করিবার প্রারম্ভেই একটী কথার উল্লেখ করা প্রায় একরূপ প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধিকাংশ সমালোচকই সেই প্রথার অনুসরণ করেন,—আমরাও করিতে বাধ্য,—আবশ্যকতার অনুরোধেই বাধ্য। কথাটী এই যে, রাজকৃষ্ণবাবুর লেখনীর ক্ষণমাত্র বিশ্রাম নাই; উহা বারমাস সমভাবে কার্য্য করিতেছে। রাজকৃষ্ণবাবু গ্রন্থের পর গ্রন্থ লিখিয়া প্রকাশিত করিতেছেন। পদ্য গদ্য, কাব্য, নাটক, সন্দর্ভ, সঙ্গীত,—রাজকৃষ্ণ বাবুর 'সাহিত্য-শালায়' কিছুরই অভাব নাই। গভীর দার্শনিক তত্ত্ব হইতে জলবৎ-তরল 'চুটকী-গল্প',—'শ্মশান ও জীবন' হইতে 'ঘোড়ার 'ডিম' ও 'কুপোকাৎ'—সকলই তাঁহার করতলস্থ,—যখন যাহাকে ইচ্ছা লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। অবশ্য ইয়ুরোপীয় গ্রন্থকারসম্প্রদায় যে পরিমাণে গ্রন্থপ্রণয়ন করেন, তাহার তুলনায় রাজকৃষ্ণবাবুর গ্রন্থ সংখ্যা নিতান্ত অল্প, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু আমাদের দেশীয় পুস্তকপ্রণেতাদিগের সচারাচর যেরূপ কার্য্যফল, সে হিসাব ধরিলে, সংখ্যায় রাজকৃষ্ণবাবুর গ্রন্থেরই শ্রেষ্ঠত্ব। পরন্তু তিনি যে অনুপাতে কার্য্য করিতেছেন তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিলে, 'সংখ্যার হিসাবে' কোন কোন বিদেশীয় গ্রন্থকারের সমকক্ষ হইতে তাঁহার বড় অধিক দিন লাগিবে, এমত বোধ হয় না। তবে সে স্থলে গ্রন্থ-সংখ্যার আধিক্য সে স্থলে তাহাদিগের সারবত্তার কিঞ্চিৎ অল্পতা সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে, ঘটা স্বাভাবিক। বিশেষতঃ বাঙ্গালীর দুর্ব্বলদেহসংশ্লিষ্টমস্তিষ্ক হইতে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহা সংখ্যায় অধিক হইলে সারবত্তায় কিঞ্চিৎ ন্যূন হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? রাজকৃষ্ণবাবুর লেখনী অবিশ্রান্ত, অতএব সকল সময়েই যে তদ্দ্বারা 'মণিমুক্তা' সমুৎপন্ন হইবে, এরূপ আশা করা অন্যায়। রাজকৃষ্ণবাবু 'অবিরত' গ্রন্থ লিখিতেছেন, সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে 'কাচ-কাঞ্চন' উভয়ই থাকা সম্ভব,—উভয়ই আছে। সমালোচকের হস্তে মধ্যে মধ্যে যখন কাচ আসিয়া উপস্থিত হয় তখন কাচকে 'কাচ' বলা যেমন তাঁহার কর্ত্তব্য, তেমনি কাচনির্ম্মাতা যে কাঞ্চনেরও জনয়িতা ও ক্রমাগত কাচকাঞ্চন উভয়ই উৎপন্ন করিতেছেন ইহা উল্লেখ করাও উচিত; নতুবা সম্যক্‌রূপে কর্ত্তব্যপালন করা হয় না।

উপরে আমরা যে প্রথাটীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছি তাহা কি ও কি জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এক্ষণে সকলেই বুঝিতে পারিয়া থাকিবেন। রাজকৃষ্ণবাবু অতি উচ্চশ্রেণীর কবি না হইলেও, স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি যে তাঁহার কিয়ৎপরিমাণে আছে, সে বিষয়ে বোধ হয় সকলেরই সন্দেহাভাব। কেবল

ছন্দোময়ী রচনাতেই যে রাজকৃষ্ণ বাবুর স্বাভাবিক পটুতা আছে তাহা নহে, তাঁহার কল্পনাও প্রখর বটে। ছন্দোময়ী রচনা ও কল্পনা উভয় দিকেই তিনি কবি। কিন্তু এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, কবির 'কলম' অবিশ্রান্ত ভাবে চলা ভাল কি মন্দ? প্রশ্নটী বিলক্ষণ গুরুতর, অতএব এস্থলে ইহার সম্যক্ বিচার করা অসম্ভব,—দুই একটী কথার আলোচনা করা যাউক। প্রথম কথা,—কবিত্ব জিনিষটী কি? সকলেই বলিবেন, উহা একটী বিশেষ মানসিক শক্তি, কেহ হয়ত ঐ শক্তির ব্যাখ্যাকরাপ্রসঙ্গে বলিবেন উহা একটী অগ্নিবৎ 'পদার্থ',—প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন অংশসংযোগে কোমল, মধুর ও প্রশান্ত—উগ্র, আবেগময় ও প্রচণ্ড,—সর্ব্বথা সরল ও স্বাভাবিক। কবির কথাই মানিলাম। কবির কথায় কবিত্বকে আগুনই বলিলাম। কিন্তু সেই আগুনের অগ্নিত্ব রক্ষা হয় কিসে? কেহ হয়ত বলিলেন "আগুনের আবার অগ্নিত্ব রক্ষা কি? আগুন আগুনই। যেমন ইচ্ছা তেমনি ভাবে ব্যবহার কর,—অগ্নির 'অগ্নিত্ব' ও উত্তাপ অবশ্যই থাকিবে। যে হৃদয়ে কবিত্বের আগুন আছে সে হৃদয় স্বভাবতঃই আলোক ও উত্তাপ নিঃসরণ করে;—না করিয়া থাকিতে পারে না। আর সেই আলোক ও উত্তাপে অন্য শত শত হৃদয় আলোকিত ও উত্তপ্ত হয়। ফলতঃ কোন না কোন প্রকারে স্বতঃনিঃসৃত হওয়া কবিত্বরূপ অগ্নির স্বভাব। উহা চাপিয়া রাখিবার যো নাই, আপনা হইতেই জ্বলিয়া উঠে ও যাহা স্পর্শ করে তাহাই আগুন করিয়া তুলে।" ঠিক কথা। কিন্তু কবিত্বের আগুন ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়ে সর্ব্বদাই যে জ্বলিয়া থাকিবে, ইহার প্রমাণ কি? কোন দ্রব্যকে অগ্নিময় করাই অগ্নির 'অগ্নিত্বের' প্রমাণ, অন্যথা তাহার স্বরূপের অভাব বুঝিতে হয়। তোমার হৃদয়ের 'কবিত্ব উদ্বেলিত হইয়া যখন অন্যের হৃদয় মাতাইতে পারে,—ভরময় করিতে পারে,—তখনই তাহার প্রকৃত অবস্থা—স্বাভাবিক অগ্নিময়তা। কিন্তু যখন তোমার 'কবিবাক্য' অন্যের হৃদয় স্পর্শ করিতে অসমর্থ, তখন তাহা হইতে কবিত্বের বিচ্ছেদ বা তাহার প্রকৃত অগ্নিময়ভাব অভাব হইয়াছে অবশ্যই বলিতে হইবে। অতএব তখনই তোমার অগ্নির অস্তিত্বের প্রমাণাভাব।

কবিবাক্যে 'অগ্নিময়ভাব' অভাব বা তাহা হইতে কবিত্বের বিচ্ছেদ প্রায়শই ঘটিতে দেখা যায়। কবি নিজহৃদয়ের প্রকৃতভাব না বুঝিয়া পূর্ব্ব-অভ্যাসবশতঃ কথা বলাতেই এরূপ ঘটনা ঘটে। যেস্থলে একসময়ে আগুন ছিল সে স্থলে অন্য আর এক সময়ে তাহা না থাকিতেও পারে, অতএব অগ্নির অস্তিত্ব বিষয়ে অগ্রেই কৃতনিশ্চয় হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বে অগ্নি ছিল অতএব পরেও থাকিবে, এই ভাবিয়া অগ্নিশূন্যস্থানে আঘাত করিলে তথা হইতে কেবল ভস্মই উড়িবে, অগ্নি দেখা দিবে না। পক্ষান্তরে খানিকটা আগুন লইয়া যদি তুমি ক্রমাগত মাটির উপর বগ্‌ড়াইতে থাক, কিছুক্ষণ মধ্যেই তাহা স্বভাবতই নির্জ্জীব ও নির্ব্বাপিত হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য যে, কবিত্বসম্বন্ধেও ঠিক্ ঐ নিয়ম। সযত্নে রক্ষা এবং উপযুক্ত ও সময়োচিত ব্যবহার করা ব্যতীত কবিত্বের প্রকৃতভাব কদাচিৎ জীবিত থাকে।

অপিচ আহার্য্য ভিন্ন কোন দ্রব্যই সজীব থাকিতে পারে না;—কবিত্ব বা অগ্নি কেন থাকিবে? কাষ্ঠ বা তদনুরূপ কোন দ্রব্য

সময়ে সময়ে না যোগাইলে অগ্নি নির্ব্বাণ হয়। চিন্তা, কল্পনা, ও ভাবানুভূতির বিচ্ছেদে কবির কবিত্ব থাকে না। ক্রমাগতই ভাবপ্রকাশে নিযুক্ত থাকিলে ভাব অনুভব করিবার জন্য সময় অতি অল্পই থাকে সুতরাং কবিত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় অবিশ্রান্ত লেখক। অবিশ্রান্ত-লেখনীসঞ্চালনহেতু সময়ে সময়ে তাঁহার কবিত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যাহা হউক রাজকৃষ্ণ বাবুর কবিত্বের 'পরিমাপ' করা এস্থলে আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার 'যদুবংশধ্বংস নাটকই' আমাদের আলোচ্য।

বলা অতিরিক্ত যে, 'যদুবংশধ্বংসের' উপাখ্যানভাগ মহাভারত হইতে গৃহীত। এই উপাখ্যান কি, তাহা কাশীদাসের 'মুষল পর্ব্বের' প্রসাদাৎ ও কথকঠাকুরদিগের অনুগ্রহে, বঙ্গের 'আবালবৃদ্ধবনিতা' প্রায় সকলেই জানে। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে দেখিলে 'যদুবংশধ্বংস' লোক সংখ্যাধিক্যেরই ফল। আধি-ব্যাধি, পাপ-তাপ, ব্যভিচার অনাহার—লোক-সংখ্যাধিক্য-জনিত অবশ্যম্ভাবী অশুভ। এই সকল অশুভ দূরীকরণার্থে লোকসংখ্যা হ্রাস করা প্রয়োজন। হ্রাস করার উপায়,—বৃদ্ধি না করা ও ধ্বংস করা। বহুবিধ নৈসর্গিক উপায়ের মধ্যে দেশব্যাপী-যুদ্ধ অন্যতম।

যদুবংশ শাখাপ্রশাখাদির সহিত ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে হইতে বিপুল আকার ধারণ করিল। ছাপ্পান্নকোটী যদুবংশের ভারে বসুমতী কম্পান্বিতা। আধেয় আধারের অসামঞ্জস্যপ্রযুক্ত প্রকৃতি কাতরা। পাপের ভরা পূর্ণ—'কানেকান'। স্বভাবতই 'বানচাল' হইল। জগদীশ্বরের অংশ ও অবতার স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সাক্ষাৎসম্বন্ধে যাহার অভিভাবক, সেই দোর্দ্দণ্ড প্রবলপ্রতাপান্বিত দেবাংশসম্ভব 'যদুবংশও' প্রাকৃতিক নিয়মাধীন। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যদুবংশীয়দিগের ধ্বংস আবশ্যক হইল, সুতরাং কাহার সাধ্য তাহা নিবারণ করে? শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই ধ্বংসের যথাযথ আয়োজন ও উপায়বিধান করিলেন, নতুবা তাঁহার দেবত্ব রহিবে কেন? ব্রহ্মশাপে মনুষ্য 'লৌহমুষল' প্রসব করিল। কাল্পনিক মুষল উপলক্ষমাত্র, আত্ম-কলহ-জনিত আভ্যন্তরিক সমবানলে যদুবংশীয়গণ পতঙ্গবৎ মুহূর্ত্তেকে পুড়িয়া মরিল। পৃথিবীতে পুনরায় 'সংখ্যা'-সাম্য সংস্থাপিত হইল।

মূলমহাভারতকার 'যদুবংশ ধ্বংসে' নৈসর্গিক নিয়মের সহিত শ্রীকৃষ্ণের দেবভাবের সামঞ্জস্য করিয়া উভয়েরই গৌরবরক্ষা করিয়াছেন। রাজকৃষ্ণবাবুও আধুনিক অর্থবিজ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কৃষ্ণের মুখে কহাইয়াছেন;—

যতদূর প্রয়োজন
তা'রে চেয়ে বেশী ভাল নয়;
বেশী হ'লে কর তারে ক্ষয়,—শাস্ত্রের বচন।
আধার আধেয় যদি সমান না হয়
বিভ্রাট ঘটয়।
পৃথিবীর অবস্থা বুঝিয়া জীব থাকা চাই;
লোকাধিক্যে ঘটয় উৎপাত—
দুর্ভিক্ষ সঞ্জাত, গৃহবিসম্বাদ,
দারিদ্র্য-পীড়ন, যন্ত্রণা-ভীষণ,—
নানাবিধ দুর্ব্বিপাক ঘটে
নিয়মের শৃঙ্খলার পটে'
বিশৃঙ্খলা জ্বালা বড় বাড়ে।"

আধার আধেয় সমান থাকা আবশ্যক; অসামঞ্জস্যহেতুই 'যদুবংশধ্বংস'-উপাখ্যানের

উৎপত্তি। কিন্তু এই নিগূঢ় কথা সচরাচর সকল লোকে ভাল করিয়া বুঝে না। সাধারণ লোকে কাল্পনিক উপন্যাসভাগের প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য রাখে, তাহার মূলনিহিত বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতি প্রায়ই দৃষ্টি করে না। যাহা স্থূলদৃষ্টির দূরবর্ত্তী, তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী করিবার চেষ্টা করিলে, আমাদের বিবেচনায় রাজকৃষ্ণবাবু ভাল করিতেন। যে বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর যদুবংশধ্বংস মূলতঃ সংস্থাপিত, রাজকৃষ্ণবাবুর নাটকে, কবিত্বের হৃদয়গ্রাহী বর্ণে, সেই সত্যটী বিশদরূপে অঙ্কিত হইলে বড়ই সময়োপযোগী হইত; তদ্দ্বারা যে কেবল সাহিত্যাংশে গ্রন্থখানির গৌরববৃদ্ধি হইত তাহা নহে, একটী অবশ্যজ্ঞাতব্য সামাজিকতত্ত্বও প্রশস্ত ও মনোজ্ঞ উপায়দ্বারা সাধারণে প্রচারিত হইতে পারিত। কিন্তু নাটককার মহৎ সুযোগ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কাশীদাসের মুষলপর্ব্বেও লোকাধিক্যের অনিষ্টকারিতার বিষয়ের উল্লেখ আছে;—

"স্থানে স্থানে বসতি লোকেতে পূর্ণ সব,
নগরভিতরে যত লোক কলরব;
ঠেলাঠেলি গতায়াতে পথ নাহি পায়;
পথঘাট লোকেতে পূর্ণিত সর্ব্বথায়।
দেখিয়া চিন্তিত হইলেন নারায়ণ,
কি উপায় করিবেন ভাবেন তখন,—
পৃথিবীর ভার আমি করিব সংহার;
আমা হৈতে হৈল আরো চতুর্গুণ ভার।"

যে ভারতবর্ষে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা'-মত ধর্ম্মকর্ম্মের অঙ্গীভূত ও বংশবৃদ্ধি করা জীবনের সার উদ্দেশ্য, যে দেশে Increase and multiply ভিন্ন কথাটী নাই, সে দেশে লোকাধিক্যের অপকারিতা ও তাহা নিবারণের উপায় অনুভূত হইয়াছিল—কথাটী শুনিতে আশ্চর্য্য বটে। কিন্তু আশ্চর্য্য হইলেও সত্য। ম্যাল্‌থসের বহুপূর্ব্বে ভারতবর্ষে ম্যাল্‌থস্ জন্মিয়াছিল ও ভারতবাসীরা লোকসংখ্যাঘটিত প্রশ্নের যথাযথ মীমাংসা করিয়াছিলেন—'যদুবংশধ্বংস' পাঠ করিলে তাহা কিয়ৎপরিমাণে বুঝা যায়।

পুরাতন কাহিনী নূতন ছাঁচে ঢালিয়া তাহাতে অধিকতর বৈচিত্র্য ও সজীবতা প্রদর্শন করাই পুরাতন কাহিনীর পরবর্ত্তী লেখকদিগের গুণপনা ও গৌরবের পরিচায়ক। সমালোচ্যগ্রন্থের লেখক সেই গুণপনা ও গৌরবের পরিচয় দিতে তাদৃশ সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। পক্ষান্তরে সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে, তাঁহার এই গ্রন্থখানি সম্যকরূপে 'নাটক'ভাবাপন্ন হইয়াছে ইহাও বলা যায় না। নাটক যে যে ধর্ম্মাক্রান্ত হওয়া উচিত, তাহার কোন কোনটী ইহাতে থাকিতে পারে, কিন্তু সমস্তগুলি নাই,—যাহা প্রধান ও অপরিহার্য্য তাহাই নাই। নাটক ও কাব্যগ্রন্থমাত্রই হৃদ্‌গতভাবের প্রতিকৃতি, প্রতিকৃতি যে পরিমাণে প্রকৃত ও উজ্জ্বল হয় সেই পরিমাণে গ্রন্থের সার্থকতা। সুখদুঃখ-সঙ্কুল-জীবন, ঘটনারই সমষ্টি। ঘটনাপরম্পরার আকুঞ্চন ও প্রসারণে হৃদয় কোন্ সময়ে কি রূপ অবস্থাপন্ন হয় নিরূপণ করিয়া তাহার হৃদয়গ্রাহী ছবি আঁকিতে হইবে। কায সহজ নয়। সহজ নয় বলিয়াই কবিসম্প্রদায়ের এত মাহাত্ম্য, এত আদর। কাব্যকার ও নাটককারে উল্লিখিত একই কার্য্যের 'ভাগাভাগি'। হৃদয়ভাবের যে অংশ অন্যের নিকট বক্তব্য, সেই অংশেই নাটককারের অধিকার,—সেই অংশ লইয়া হৃদয়ের ঘাতপ্রতিঘাত ও পরিবর্ত্তনপ্রদর্শন করাই নাটককারের

কার্য্য। ফলতঃ হৃদয়ের ঘাতপ্রতিঘাত ও চিত্তবৃত্তির বৈচিত্র্য লইয়া নাটক বা তাহার সাবসত্ত্বা। উহাদের অভাবে নাটকের নাটকত্ব সম্ভবে না। রাজকৃষ্ণবাবুর গ্রন্থে উহাদের অপ্রাচুর্য্যহেতুই আমরা তাহাকে নাটক বলিতে কুণ্ঠিত। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে বলরামের চিত্রটী আমাদের বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইয়াছে। কালপুরুষও নিতান্ত মন্দ হয় নাই। সে "মায়ার" মোহিনীশক্তিতে জগৎ মুগ্ধ. তাঁহার চিত্রে যথোপযুক্ত কমনীয়তা প্রদান করিতে কবি কি জন্য কৃপণতা করিয়াছেন বলিতে পারি না।

গ্রন্থখানির ভাষা অতি সরল। যতদূর সরল হইতে পারে, রাজকৃষ্ণবাবু তাহা করিয়াছেন। তবে কোন কোন স্থানের ভাষা কিঞ্চিৎ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে ও সর্ব্বত্র ভাবের উপযোগী হয় নাই।

দেবকী যদুসন্তানগণের ধ্বংসবিবরণ শুনিয়া খেদ করিতেছেন;—

"হায় হায়, যদুকুলধ্বংসকথা-কোটী বজ্র সম পড়িল প্রাণের শিরে!"

ইহা আলঙ্কারিকের ভাষা হইতে পারে, কিন্তু শোকাতুরা স্ত্রীলোকের হৃদয়ের ভাষা নয়।

নাটকের ভাষা ছন্দোময়ী হওয়া মন্দ নহে। বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষার এই 'এলোমার্কণ্ডী' অবস্থায় নাটকাদিতে আমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়ও বটে; তবে যে সকল স্থলে দুই চারিটা 'শাদামাঠা' গদ্য কথায় ভাবটী অধিকতর প্রস্ফুটিত হয়, সে সকলস্থলে ছন্দের 'রসারসতি' ভাষাকে বন্ধন করা বিড়ম্বনামাত্র। সমালোচ্য গ্রন্থ সমাকরূপে এ বিড়ম্বনা বিবর্জ্জিত নহে।

কাশীদাস রাজকৃষ্ণ বাবুর অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালাভাষার শক্তি ও সঙ্গতি উভয়ের বিলক্ষণ অভাব ছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। রাজকৃষ্ণ বাবু বর্ত্তমান সময়ের কবি, এ সময়ে বঙ্গভাষা অপেক্ষাকৃত শক্তি ও সঙ্গতিশালিনী হইয়াছে। কাশীদাস ও রাজকৃষ্ণবাবু উভয়েই যদুবংশধ্বংসের বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা উভয়েরই বর্ণনার দুই এক স্থান উদ্ধৃত করিতেছি। কাহার কত বাহাদুরী পাঠক বিচার করুণ।—

সাত্যকির সহিত কৃষ্ণের বাদানুবাদ।

(যদুবংশধ্বংস নাটক)

"কৃষ্ণ।—না সাত্যকি, মিথ্যা কথা নহে;
হয় কি স্মরণ?—
ভূরিশ্রবা বীর যবে তব কেশে ধরি,
তুলিল দারুণ খড়্গ কাটিতে তোমারে
ভয়ঙ্কর রণাঙ্গণে?
হয় কি স্মরণ?—
সে কালে অর্জ্জুনে আমি কহিলাম ডাকি,
সাত্যকিরে বাঁচাও অর্জ্জুন?
হয় কি স্মরণ?—
অবিলম্বে ধনঞ্জয় খরতর শরে
ভূরিশ্রবা ভূপালের খড়্গ-ধরা-কর
কাটিয়া, অপর কর করিল ছেদন?
তার পর, হয় কি স্মরণ?—
ছিন্নহস্ত ভূরিশ্রবা—অসহায় বীরে
বধিলে নিজের খড়্গে তুমি?
সাত্যকি।—না চাই শুনিতে তব কথা,
অবীরের বৃথাবাক্য বীর নাহি শুনে।
নিজ দোষ ঢাক' আগে,
পর দোষ উদ্‌ঘোষিও পরে।
ছল করি' কপট লম্পট

অর্জ্জুনে ভুলায়ে লয়ে
যদি না বঞ্চিতে নিশি অন্যঠাঁই তুমি,
তবে কি মরিত কভু
দ্রৌপদীর পঞ্চশিশু নিদ্রিতদশায়—
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডির সনে,
অশ্বত্থামা পাতকীর করে?
নিজে মহা-পাপী হয়ে
পরপাপ গাহ কোন মুখে?
ধিক থাক তোমা—
তুমি কাপুরুষ, স্বার্থপর, নীচ।"
(কাশীদাসের মুষল পর্ব্ব)

কৃষ্ণ।—ভয়ান্বিত হীনশক্তি হীন-অস্ত্র জন,
তোমার যুদ্ধের যোগ্য এই সব হন।
সোমদত্ত-সুত ভুরিশ্রবা নরপতি
যুঝিতে আসিয়াছিল তোমার সংহতি,
নিজশক্তি না জানিয়া যুদ্ধে দিলা মন,
যে গতি করিল তোমা হয় কি স্মরণ?
হীন-অস্ত্র কৈল তোমা সংগ্রাম ভিতরে,
কেশে ধরি উদ্যম করিল কাটিবারে।
হেন কালে কহিলাম অর্জ্জুন নিকটে,—
হের, দেখ, নিশিপুত্র পড়িল সঙ্কটে,
ভুরিশ্রবা কাটে দেখ সাত্যকির শির,
ত্বরিতে করহ রক্ষা, ধনঞ্জয় বীর।
আমার বচনে তবে কুন্তীর কুমার
খড়্গ লয়ে হস্ত কাটি ফেলিলেক তার।
হস্ত কাটা গেল তার অর্জ্জুনের বাণে,
ভূমে লোটাইয়া বীর পড়ে সেইক্ষণে।
ভূমিতে পড়িল, প্রায় ত্যজিল জীবন,
খড়্গ লয়ে তুমি তারে কাটিলা তখন।
এই বীরপণা তুমি করিলে সমরে!
দর্প করি কথা কহ সভার ভিতরে?
(ইত্যাদি)।"

"সাত্যকি।—গর্জ্জনেতে বলিলেন গোবিন্দের প্রতি,—
আমারে এমন বাক্য কহ রে দুর্ম্মতি?
তোমার দুষ্কর্ম্ম যত কেবা নাহি জানে?
কপটে নাশিলা পাণ্ডবের বন্ধুগণে।
অবোধ পাণ্ডব সব তোমার উত্তরে
রণজয় করিয়া রহিল স্থানান্তরে;
যদি সবে একঠাঁই রক্ষিত রজনী,
তবে কেন সর্ব্বনাশ করিবেক দ্রৌণি?

* * *

যদি আমি থাকিতাম, কিম্বা পাণ্ডুসুতে,
কার শক্তি দ্রৌপদীর পুত্র বিনাশিতে?
তোমার কপটে হৈল পাণ্ডুবংশ-ক্ষয়!
তোমা সম কপটী কে আছে দুরাশয়?

* * *

জরাসন্ধ ভয়েতে ত্যজিয়া মধুপুরী
সমুদ্রভিতরে বৈস দ্বারকানগরী।
ক্ষুদ্রজন বড়জন কেবা নাহি জানে?
নন্দের নন্দন তুমি বাস বৃন্দাবনে!
গোপ-অন্ন খাইয়া রহিলা গোপগৃহে;
গোপাল বলিয়া নমে তেঁই লোকে কহে!"
(ইত্যাদি)।

অর্জ্জুনের বিলাপ।

(যদুবংশ ধ্বংস নাটক)

"হা সখা! হা মধুনাথ!
বজ্রাঘাত আজি মোর শিরে!
সখাশূন্য এ ছার জীবন
দুর্ব্বহ হইল এবে মোর!
এক আত্মা আমাতে তোমাতে,
একপ্রাণ অর্জ্জুন কেশব,
বলিতে যে তুমি মোরে?
আজ কেন কেন রিপবীত ভাব?
তোমারে অভাব নাহি সয়,
হৃদয়আঁধার করি, হরি,
কোথা গেলে ফেলিয়া অর্জ্জুনে?

কি কহিব রাজা যুধিষ্ঠিরে ?
দ্রৌপদীরে নয়নের নীরে
ভাসাইব কি বলিয়া, সখা ?
কৃষ্ণরূপ-প্রাণশূন্য দেহ
কেমনে ধরিব আমি আর ?
হৃদে প্রাণ করে হাহাকার
আঁধার আঁধার হেরি
শূন্যময় চারিধার।
সখা হে আমার, কোথা গেলে ?"
(ইত্যাদি)।

(কাশীদাসের মুষলপর্ব্ব)

"কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ নাথ, কৃষ্ণ ধনজন,—
হরি বিনা পাণ্ডবের আছে কোন জন ?
এতদিনে পাণ্ডবেরে বঞ্চিলেন বিধি ;
কোন্ দোষে হারাইনু কৃষ্ণ গুণনিধি ?
এই দ্বারাবতী আমি পূর্ব্বে আসিতাম,
আমারে পাইলে কত পাইতে বিশ্রাম ?
'সখা' সখা বলি মোরে করি সম্বোধন,
ভুজ পসারিয়া আসি দিতে আলিঙ্গন।
পূর্ব্বেতে কহিলা তুমি সভার ভিতর,—
'কৃষ্ণার্জ্জুন একতনু—নহে ভিন্ন পর ;
পাণ্ডুপুত্রগণ মম প্রাণের সমান,
পাণ্ডবের কার্য্যেতে বিক্রীত মম প্রাণ'।
সাবধিত্ব করিয়া সঙ্কটে কৈলা পার ;
দুর্য্যোধন ভয় হইতে করিলে উদ্ধার।
আমি তব সখা, প্রাণসখী যাজ্ঞসেনী।
পরম বান্ধবরূপে রাখিলা আপনি।
পাখা যেন রক্ষা করে পাখীর জীবন,
সলিল রক্ষিত যেন মৎস্য আদি জন—
সেইরূপে রক্ষিতে পাণ্ডবে, নারায়ণ।
তোমা বিনা কি প্রকারে রহিবে জীবন ?"
(ইত্যাদি)

রাজকৃষ্ণবাবুর বর্ণনা মন্দ হইয়াছে বলিতেছি না। তবে উহা কাশীদাসের বর্ণনা অপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল ও হৃদয়গ্রাহী হইলেই বর্ত্তমান সময়ের ও রাজকৃষ্ণবাবুর ন্যায় কবির গৌরবরক্ষা করিতে সমর্থ হইত।

'যদুবংশ-ধ্বংস' নাটকের কয়েকটী গীত অতি 'পরিপাটী' হইয়াছে। আমরা নিম্নে একটীর কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"হৃদয়ের সুখ হৃদয়ে লুকা'ল,
নাথ যা'রে ছাড়িয়ে ;
শরতের চাঁদ সাগরে ডুবিল,
আঁধার আইল বাড়িয়ে।
* * *
মিশিল হাসি অশ্রু হায়,
লুকাল প্রাণ-হুতাশ বায়
বিরহ-হুতাস ভীষণ তায়
মরিবে অভাগী পুড়িয়ে।"

রাজকৃষ্ণবাবুর এই ক্ষুদ্র নাটকখানির প্রধান গুণ এই যে, ইহা পাঠকমাত্রেরই সহজবোধ্য। ইহার ভাষা ও ভাবে জটিলতার লেশমাত্র নাই। নাটকখানি অভিনয়েরও বেশ উপযোগী হইয়াছে। ঠ

সার-সংগ্রহ।

মাসিকপত্র।

আর্য্যদর্শন—চৈত্র, ১২৯০। ৯ম খণ্ড—৮ম সংখ্যা।

বঙ্গভাষায়, সাময়িকপত্রের এখনও আশানুরূপ আদর হয় নাই,—কেবল আরম্ভ-মাত্র। কিন্তু কপালগুণে কোরকেই কীট প্রবেশ করিয়াছে। বঙ্গদর্শন, বান্ধব প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পত্রগুলির অবসাদ-হ্রদে নিমগ্ন হইবার কারণ কি? কারণ একটী নহে, ত্র্যহস্পর্শ যোগেই বঙ্গীয় সাহিত্যের শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। কতক সম্পাদকের দোষে, কতক গ্রাহকের দোষে আর কতক আবশ্যকতা সৃজন করিতে না পারায় বঙ্গসাহিত্য বিশেষ উন্নতি করিতে পারিতেছে না। ঘরের খাইয়া কে কতদিন বনের মহিষ চরাইতে পারে? উন্নতির মুখে সলিল সিঞ্চন করিতে জানে, এমন লোক এ দেশে অতি বিরল, সুতরাং উৎসাহ সমান তেজে উঠিতে পায় না। আর্য্যদর্শন যে ক্রমে বিঘ্নবিপত্তি কাটাইয়া উঠিতেছে ইহাতে আমরা বড়ই সুখী হইলাম। কোন প্রকারে এই অষ্টম সংখ্যায় খণ্ড শেষ করিয়া আর্য্যদর্শন সময়ের সহিত সমপদে গমন করিবার চেষ্টা করিতেছে। ভরসা করি সম্পাদক ও কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়গণ ইহার লুপ্তপ্রায় খ্যাতির পুনরুদ্ধার করিতে যত্নের ত্রুটী করিবেন না। নবম খণ্ডে কয়েকটী ভাল ভাল প্রবন্ধ আছে।

৮ম সংখ্যার বিষয়—

১। আর্য্যজাতি ও আর্য্যধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত পুরাবৃত্ত।

২। ওয়ালেস—১৪শ অধ্যায়।

৩। নিদাঘ-তটিনী—পদ্য। (শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু)।

৪। আমার স্বাধীনতা। (পরিব্রাজক)।

৫। যোগাঙ্গ বীর্য্যাচার-বিচার। (শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম)।

৬। আগুন খাইতে পার? (শ্রীকুমারনাথ শর্ম্মা)।

৭। বিধবা বিবাহ। (শ্রীশ—)।

৮। প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। প্রথম প্রবন্ধটী নৈহাটী একতাসাধনী-সভাতে পঠিত হইয়াছিল। "যিনি কর্ত্তব্যানুষ্ঠানশীল ও অকর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখ হইয়া সর্ব্বদা সদাচারনিষ্ঠ, তিনিই আর্য্য নামে অভিহিত হন"। এই প্রকারে আর্য্যসংজ্ঞা ব্যাখ্যা করিয়া লেখক প্রস্তাবে অবতরণ করিয়াছেন। আর্য্যেরা জগতে পদার্পণ করিয়া জাতীয় জীবনের অপরিস্ফুট অবস্থাতেই ধর্ম্মধ্বজী বলিয়া গৌরবলাভ করিয়াছিলেন। ইহা প্রদর্শন করাই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য; এবং ঋগ্বেদ হইতেই তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে,—ইহার অধিক প্রাচীনকালের প্রামাণ্য শ্রুতি আর কিছুই নাই। আর্য্যেরা শীতপ্রধানদেশের আদিম অধিবাসী এবং বেলুর্তাগ ও মুস্তাগ পর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্বস্থ উচ্চতর ভূভাগ তাঁহাদিগের আদিম বাসস্থান ছিল। কালক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া আর্য্যেরা আসিয়া ও ইউরোপখণ্ডের নানাস্থানে অবস্থিতি করেন। যাঁহারা ভারতবর্ষে আগমন করেন তাঁহারাই "হিন্দু" নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

ব্রহ্মাবর্ত্তই প্রথমে আর্য্যপদার্পণে ধন্য হইয়াছিল। আর্য্যেরা কেবল প্রকৃতির উপাসক ছিলেন। হিমাচ্ছন্ন পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করাতে সর্ব্বাগ্রে অগ্নির পূজা করিয়াছিলেন, তৎপরে বরুণের উপাসক হয়েন। আকাশ ও পৃথিবীর নিকটেও তাঁহারা অবনতমস্তক ছিলেন। তাঁহারা একেশ্বরবাদ বা দেবদেবীর পূজা জানিতেন না। বৈদিক সময়ের প্রথমে বর্ণবিভাগ ছিল না—মহাভারতেও ইহা উক্ত হইয়াছে। মনুর সময় হইতে সমাজবন্ধন দৃঢ় হইলেও বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় বর্ণসকলের এত ভেদজ্ঞান ছিল না। আর্য্যসমাজে স্ত্রী জাতির আদর ছিল এবং তাঁহারা সকল বিষয়ে শিক্ষিতা হইতে ও বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ করিতে পারিতেন। বর্ত্তমান সময়ে আর্য্যজাতির হীনাবস্থায় লেখক বড় ব্যথিত হইয়াছেন। লেখক যদি চেষ্টা মানেন তবে চেষ্টাদ্বারা পুনরায় উন্নত হইতে পরামর্শ দিবেন, আর দৈববিশ্বাসী হইলে বলিবেন—"নচ দৈবাৎ পরং বলং", "ভাগ্যেনৈতৎ সম্ভবতি" ইত্যাদি কথাগুলিতে যেন কিছু সত্য আছে বলিয়া বোধ হয়!!!

৪। মনুষ্য প্রকৃতির দাস। প্রকৃতির নিকট মনুষ্যের স্বাধীনতা, স্রোতে পতিত পতঙ্গের স্বাধীনভাব, অধিক নহে। চেষ্টাটা মিথ্যা কথা—সকল কার্য্যেই "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"। প্রবন্ধের ভাষাটী বেশ পরিষ্কার ও তেজস্বী; কিন্তু দৈববিশ্বাসী ভারতবাসীর পক্ষে প্রকৃতির দাসত্ব মঙ্গলজনক বলিয়া বোধ হয় না। ভারতের এক্ষণে উৎসাহের ও কার্য্যকারিতার প্রয়োজন।

৬। আমরা অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয়, এই জন্য আমাদিগের আদর নাই, আমাদিগের দেশের আদর নাই এবং আমাদিগের ভাষারও আদর নাই। কিন্তু আমরা যে ইংরাজকে অনুকরণ করি তাহার স্বজাতি প্রেম, স্বদেশপ্রিয়তা ও স্বীয় ভাষার প্রতি অনুরাগ কি প্রকার প্রগাঢ় তাহা দেখি না ও অনুকরণ করিবার চেষ্টা করি না। আমাদিগের উৎসাহ, সাহস, অধ্যবসায় বিন্দুমাত্র নাই, আমরা সম্যকপ্রকারে অধঃপতিত হইয়াছি। ভারতের রাজলক্ষ্মীও ইংরাজশাসন ও পাশ্চাত্য সভ্যতাবিস্তারের সহিত অন্তর্ধান হইয়াছেন। এক্ষণে কি করিলে ভারতের দিন ফিরে প্রবন্ধলেখক বলেন "ঘোর পরিবর্ত্তন চাই। তাহা সামান্য নহে, ইচ্ছামত নহে। অসম্ভবকে সম্ভব করা চাই। একবারে সম্পূর্ণরূপে হৃদয় পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ভারতবাসীর অন্তরবাহ্যে স্থলস্থূল পড়িয়া যাইবে। ভিতরের ঘর বাহিরে আসিবে, বাহিরের ঘর ভিতরে যাইবে। বাহিরের চর্ম্ম অন্তরে যাইবে, অন্তরের অস্থি বাহির হইবে। ঊর্দ্ধভাগ অধঃ হইবে, অধোভাগ ঊর্দ্ধ হইবে! পূর্ব্ব ঘুরিয়া পশ্চিমে যাইবে, পশ্চিম ঘুরিয়া পূর্ব্বে আসিবে। 'দিবসে শশী সঙ্কাশ' ও 'রজনীতে সূর্য্যোদয়' হইবে। জীবিত লোক মৃত এবং মৃতলোক জীবিত হইবে! শুষ্কতরু অঙ্কুরিত হইবে। হাস্যপরায়ণ রোদন করিবে, রোদনপরায়ণ হাস্য করিবে। আকাশের তারা ভূতলে পড়িবে, ভূতলের বালুকা আকাশে উঠিবে। সহায় লাগিবে না, সম্পত্তি লাগিবে না, কেবল বাতাস ধরিয়া বিমানে উঠিতে হইবে। ভারতবাসি, তুমি কি তাহা পারিবে না? যদি না পার, আকাশ ভাঙ্গিয়া তোমার মাথায় পড়িবে! প্রাণ থাকিতে 'পারিব না' বলিও না। একবার হুঙ্কার

করিয়া উঠিয়া দাঁড়াও দেখি; উৎসাহের রথে আরোহণ কর, জ্ঞান-বর্ম্ম পরিধান কর, সাহসের চর্ম্ম ধারণ কর, আর উৎপন্নবুদ্ধির অসি চালাও দেখি? পাপীর মস্তকে পদাঘাত করিয়া; মূর্খের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে জ্ঞানের পথে উত্তোলন করিয়া, অলসতা, কাপুরুষতা, সমাজ-প্রথার মেষপাল বিস্মৃতি-মশানে বলিদান দিয়া জীবনের রণক্ষেত্রে অগ্রসর হও দেখি। তুমি পারিবে না? 'পারিব না' বলিলে আর কিছুই হইবে না। একটীবার বল দেখি 'পারিব', 'করিব'; একটীবার বল দেখি 'ভারত আমার,' 'ভারতের সুখসম্পদ আমার,' 'ভারত আমার সর্ব্বস্ব', তবেই দেখিবে, আপনা হইতেই হৃদয়-নিহিত বহ্নিরাশি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে। আভ্যন্তরিক বলবীর্য্য চতুর্গুণ হইয়া উঠিবে! একটীবারমাত্র মুখে বল 'পারিব', 'করিব', অমনি দেখিবে চতুর্দ্দিক হইতে স্বর্গীয় বল তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে থাকিবে। তোমার ধর্ম্মের জন্য, স্বীয় আত্মার জন্য, মাতৃভূমির জন্য, জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া একবার গাত্রোত্থান কর, আর্য্যাচরণ স্মরণ করিয়া, আর্য্যবলে বলবান হইয়া, ধর্ম্মের ধ্বজা তুলিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও; যাহা পঞ্চাশ বৎসর পরে সংঘটন হইবে তাহা পঞ্চবিংশতি বৎসরে সমাধা করিতে প্রয়াস পাও; যাহা পঞ্চবিংশতি বৎসর পরে ঘটিবে তাহা দশ বৎসরে সম্পন্ন কর, যাহা দশ বৎসর পরে হইবে তাহা অদ্যই সম্পন্ন করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হও; এইরূপে দূরবর্ত্তী ভবিষ্যতের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী কর; আপনার বল, বীর্য্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, রক্ত, মাংস, অস্থি পর্য্যন্ত মাতৃভূমিতে বিসর্জ্জন দাও; আপনার কার্য্য বুঝিয়া দেখ, ইহা ভিন্ন ইহলোকে মানবের আর কি কার্য্য আছে?" ইহার পর একটি বিলক্ষণ সতেজ জীবন-সঙ্গীত ভারস্বরে গীত হইয়াছে। প্রথম ও শেষ কয়েক পংক্তিমাত্র আমরা উদ্ধৃত করিলাম—

"অলসতা পরিহরি, বাজায়ে বিজয়-ভেরী,
গভীর গর্জ্জন করি, দেখ মন উঠিয়া;
কিবা কার্য্য আপনার, সংসারের কিবা সার,
উরসেতে যশোহার বার বার ধরিয়া।

*　　*　　*

পরব্রহ্ম নাম স্মরি, বালবৃদ্ধ সঙ্গে করি,
সারি সারি নরনারী ধরাসনে শয়নে;
ঝরে আঁখি মনোদুখে, মাতৃ ভূমি-নাম মুখে,
শঙ্কিণ-বিন্ধান-বুকে দেখাওরে ভুবনে।"

ভুরী, ভেরী, জয়ঢক্কা ত বাজিল, কিন্তু জাগিল কি কেহ? ভারত এক্ষণে মৃত; মৃতশরীরে অল্পে অল্পে জীবন সঞ্চার করিয়া জয়ঢক্কা বাজাইতে হয়, নতুবা কেবল তর্জ্জন গর্জ্জন সার।

প্রবাহ—বৈশাখ, ১২৯১। ৩য় ভাগ —১ম সংখ্যা।

প্রবাহ ক্ষুদ্রকায় হইবে জানিয়া আমরা পূর্ব্বে বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলাম, তবে কলেবরের ক্ষীণতার সঙ্গে উহার তরঙ্গ তেজের হ্রাস হইবে না আমাদিগের এরূপ সম্পূর্ণ আশা ছিল। এ সংখ্যায় আমাদিগের সে আশা ততদূর কার্য্যকরী হয় নাই। যাহা হউক, দামোদরবাবু এদিকে একটু বিশেষ লক্ষ্য রাখেন.—আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা। প্রবাহ আমাদিগের আদরের সামগ্রী, বিশেষতঃ বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকামনা আমাদিগের একমাত্র ব্রত, সেই

নিমিত্তই প্রবাহসম্বন্ধে আমরা এই সামান্য আভাস দিলাম। অন্যান্য কয়েকখানি পত্রিকার ন্যায় প্রবাহ যে অপরিমিত সময়ে বাহির হয় না, ইহা একটী পরম আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই।

উপস্থিত সংখ্যার বিষয়—

১। নূতন বৎসর—পদ্য। (শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গঙ্গোপাধ্যায়)।

২। শৈশব-মৃত্যু ও পীড়া। (শ্রীযুক্ত সার্জ্জন ধর্ম্মদাস বসু, এল, আর, সি, পি, এল্, আর, সি, এস্)।

৩। ন্যায়-দর্শন। (শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র শিরোমণি)।

৪। বিভিন্ন শ্লোকাবলী—পদ্য। (শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় এম,এ, বি,এল্)।

৫। মনোবিজ্ঞান। (শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র রায়, এম্, এ; বি, এল্)।

৬। রাঘব-উপন্যাস। (শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র, বি, এ)।

৭। দেশহিতৈষিতা। (শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর সিদ্ধান্ত)।

৮। যোগ। (শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায়)।

২। শৈশব-মৃত্যু ও পীড়া—(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর) "শিশুদিগের তিন প্রকার শিক্ষার আবশ্যক—শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক। শৈশবাবস্থায় তিন প্রকার শিক্ষাই বাটীতে আরম্ভ হয়, বা হওয়া উচিত; শিশুগণের অঙ্গচালনায় (যাহাতে প্রাণবিনাশের সম্ভাবনা নাই) বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। পিতামাতার নিকট স্নেহ, দয়া, পরোপকার, সাহস, উৎসাহ, সত্যপ্রিয়তা, নম্রতা প্রভৃতি সদ্গুণসকল শিখিবার সুযোগ হয় এবং উদাহরণ দ্বারা ঐ সকল বিষয় শিক্ষিত হইলে মনে উহা বদ্ধমূল হয়। শিশুদিগকে অল্পবয়সে অধিক শিখিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। এই সময়ে কেবল তাহাদিগকে বস্তুর আকার, বর্ণ, কাঠিন্য ও অন্যান্য সাধারণ গুণ শিক্ষা দেওয়া উচিত এবং যাহাতে তাহারা নিত্যপদার্থের স্থূল প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহাই করিতে হইবে। বাটীর দ্রব্যসামগ্রীর নাম, উৎপত্তি ও ব্যবহার, খাদ্যসামগ্রীর নাম, উৎপত্তি ও ব্যবহার, গো, মেষ, কুক্কুর, বিড়াল, পক্ষী, মৎস্য, ইত্যাদির আকার, স্বভাব প্রভৃতি বিষয়ও শিশু যাহা সর্ব্বদা আপন ইন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারে, সেই সমুদয় বিষয় অতি সরলভাষায় গল্পচ্ছলে তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে। মধ্যে মধ্যে তাহারা যাহা জিজ্ঞাসা করিবে তাহার স্পষ্ট উত্তর প্রদান করিতে হইবে। তাহাদের মন নানা বিষয়ে আকৃষ্ট হইলে ও নানা বিষয়ের স্থূল বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিয়া আরও ঔৎসুক্য জন্মিলে ক্রমে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিবার যত্ন ও চেষ্টা জন্মিবে; তাহাতে বুদ্ধি, স্মরণশক্তি, হিতাহিতবিচার ও চিন্তাশক্তির ক্রমশঃ উন্নতি হইবে।" এই রূপে ৬।৭ বৎসর গেলে তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবে। ডাক্তার ট্যানার, চাভাসি প্রভৃতি বিজ্ঞ বালচিকিৎসকদিগের ইহাই অভিমত। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী অতীব দূষণীয় ইহাতে কেবল ক্ষুদ্র মস্তিষ্ককে পীড়িত করা হয় মাত্র। গল্প ও কথোপকথনচ্ছলে পুস্তকান্তর্গত বিষয়সকল বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। এই উপায়ে ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে সকল বিদ্যালয়েই একঘণ্টাকাল উপদেশ দেওয়া উচিত। ডাক্তার ট্যানারের মতে ইহার অভাবই ছাত্রগণের অব্যবহার ও অধার্ম্মিকতার প্রধান কারণ।

সকল বিদ্যালযেই ব্যাযাম কবিবাব স্থান থাকা আবশ্যক,—মনেব সহিত শবীবেব উন্নতিও অত্যন্ত প্রযোজনীয় এবং ইহার অভাবে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইযা থাকে। সকল ছাত্রকেই ২।৩ ঘণ্টাব পব অর্দ্ধঘণ্টাকাল বিশ্রাম ও ক্রীড়া কবিতে দেওযা আবশ্যক। এ দেশে পবীক্ষাব প্রণালীটাও ভাল নহে, শাবীবিক উন্নতিব পবীক্ষা লওযা বিশেষ আবশ্যক এবং যে বালক বিদ্যাবুদ্ধিতে, কথোপকথনে ও বলে শ্রেষ্ঠ হইবে সেই বালকই পুবস্কাব পাইবাব উপযুক্ত। অযথা ও অতিবিক্ত মানসিক পবিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয,—ইহাতে অজীর্ণ, মস্তিষ্কের পীড়া, হৃৎপিণ্ডেব অস্বাভাবিক স্পন্দন প্রভৃতি উৎকট বোগ জন্মে। দিন রাত্রিতে ৭।৮ ঘণ্টাব অধিক পবিশ্রম কবা কাহাবও পক্ষে সুযুক্তি নহে এবং অল্পবযস্কবালকদিগেব পক্ষে ৩।৩½ঘণ্টাই যথেষ্ট। অতিবিক্ত মানসিক পবিশ্রমেব দ্বারা কি কি উৎকট পীড়া জন্মিতে পাবে তাহাব উল্লেখ কবিযা লেখক প্রস্তাব শেষ কবিযাছেন এবং বলিযাছেন যে, বালক বালিকাব শবীবে পীড়াব বীজ থাকিলে স্নেহ-পববশ হইযা তাহাদিগকে সকল কার্য্যে সম্মতি এবং কঠিনাস্তঃকবণ হইযা দমন করা উভয়ই অনিষ্টকব; অতএব সন্তানপালন কবিবাব জন্য এতদুভযই পবিত্যাজ্য। আমরা অবগত হইযাছি যে, প্রবন্ধটী পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছে। এ প্রকাব পুস্তকের বিলক্ষণ অভাব বটে।

৫। মনোবিজ্ঞান—(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)। "যে প্রণালী অবলম্বন কবা ও যে কযেকটী নিযমেব বশবর্ত্তী হওযা দার্শনিকগণের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক বলিযা ইত্যগ্রে উল্লিখিত হইযাছে" এ সংখ্যায তাহাব সংক্ষিপ্ত বিববণ প্রদত্ত হইযাছে। যে ১০টী নিযমেব সংক্ষিপ্ত বিববণ দেওযা হইযাছে, মনোবিজ্ঞান আলোচনা কবিবাব জন্য সে গুলি বিলক্ষণ প্রযোজনীয় ও সুবিধাজনক।

মাস সমালোচন।

[এই পত্রেব 'মাস সমালোচন' এবং 'সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ' ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত হয, অতএব বিষযবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা।]

দেখিতে দেখিতে পুরাতন বৎসর শেষ হইয়া নূতন বৎসরের একমাস অতীত হইয়া গেল। আমাদের জন্মভূমি শোকে দুঃখে,—কষ্টে যন্ত্রণায় জীবনের আর এক বৎসর অতিবাহিত করিলেন। ভারতবর্ষ বহুকালের পুরাতন দেশ। এই দেশ হইতেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সভ্যতার বিস্তার। প্রলয় ও পবিবর্ত্তন, বিপ্লব ও বিড়ম্বনা, ভারতবর্ষ অনেক দেখিযাছেন,—পৃথিবীকে অনেক দেখাইয়াছেন। স্বভাবের নিয়মে ভারত বক্ষে সুখও দুঃখ উভয়ই অভিনীত হইয়াছে,—প্রতিদিন অভিনীত হইতেছে। সুখ ও দুঃখ উভযই অবশ্যম্ভাবী;—উভয়ই নৈসর্গিক নিয়মসম্ভূত। যে কালচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে ভারতবর্ষ একদিন সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ সোপানে, গৌরবের গরিষ্ঠ মঞ্চে, সুখ-শান্তি-সৌভাগ্যের শ্রেষ্ঠতম স্থানে আরোহণ করিয়া-

ছিলেন,—সেই কালচক্রের পুনরাবর্ত্তনে ভারতবর্ষ আজ ঘৃণিতেরও ঘৃণিত, নিপীড়িত, পদদলিত,—দুঃখ-যন্ত্রণার আবাসভূমি, অগৌরবের আশ্রয়স্থল।।। আজ স্বর্গ নরকে,—নরক স্বর্গে!!! অহো!! প্রাকৃতিক শক্তির কি কঠোরতা,—জড় জগতের কি দৌরাত্ম্য!!

ভারতমাতা শেষদশায় অনেক দুঃখ পাইয়াছেন,—অনেক কষ্টযন্ত্রণা—অনেক গ্লানি গঞ্জনা সহ্য করিয়াছেন। অভিমানে শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে,—হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে! কিন্তু সকলপ্রকার বিঘ্ন-বিড়ম্বনা সত্ত্বেও কালের অতল গর্ভে তাঁহার অস্তিত্ব ডুবিয়া যায় নাই—নামও পূর্ব্বে স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই। ভারতমাতা আজও সেই ভারতমাতা আছেন। কাহার সাধ্য তাঁহার 'ব্যক্তিত্ব'—বহুশতাব্দীর গৌরব-সঞ্জাত অনুপম 'ব্যক্তিত্ব'—ধ্বংস করে বা অন্যদীয় অস্তিত্বের সহিত মিশাইয়া দেয়! অশেষ দুঃখযন্ত্রণা,-ঘৃণা-অভিমান বক্ষে ধারণ করিয়া ভারতমাতা অদ্যাপি স্বধর্ম্মে জীবিত আছেন,—অদ্যাপি স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে ও পূর্ব্বসঞ্চিত অতুল ও অক্ষয় মানসিক সম্পদে সমগ্র জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়া পূজিত হইতেছেন। অধঃপতি ভারতভূমি পূজিত,—এখনও অন্যান্য জাতীয়দিগের বিস্ময়ও প্রশংসা উদ্দীপনও আকর্ষণ করিতে সমর্থ;—ইহা মনে হইলে হৃদয়ে স্বভাবতই একটু উষ্ণশোণিত সঞ্চালিত হয়;—আনন্দের মুগ্ধকরী আবেগে হঠাৎ ধমনী নাচিয়া উঠে। কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য।

যখন মনে হয় যে, জন্মভূমি স্বর্ণপ্রসবিনী হইয়াও আজ পথের কাঙ্গালিনী—সামান্য অন্নবস্ত্রের জন্যও পরমুখাপেক্ষিনী, তখন দুঃখে বিষাদে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে,—হৃদয়ের অন্তঃস্তল বিদগ্ধ হইয়া যায়। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা যে অতীব বিপন্ন এবং শোচনীয় তাহা কেহই অবশ্য অস্বীকার করেন না। কিন্তু আক্ষেপ এই যে, সে বিষয়ে অতি অল্পলোকেই চিন্তা করেন—অতি অল্পলোকেই তজ্জন্য আন্তরিক ব্যথিত হন। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু দেশের দুরবস্থা ও দারিদ্র্য কিছুই কমিতেছে না, বরং দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে। পাশ্চাত্যশিক্ষায় ও ইংরেজের 'উত্তেজনায়' আমাদের মোহ-নিদ্রাভঙ্গের একটু একটু উপক্রম হইতেছে বটে; কিন্তু আলস্য, উদাসীনতা, উদ্যমহীনতা, নীচাশয়তা, অনুদার স্বার্থপরতা, এবং পুরুষার্থশূন্যতা দ্বারা আমাদিগের জাতীয় জীবন এরূপ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে যে কিছুতেই আর আমরা মস্তকোত্তোলন করিয়া কর্ত্তব্যসাধনে ব্রতী হইতে সমর্থ হইতেছি না। ভারতের অদৃষ্টপটে কি লিখিত আছে, তাহা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন!

গত মাসে লিখিয়াছিলাম যে, পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার একজন বিশেষ প্রতিষ্ঠালব্ধ সভ্য, মিঃ স্লাগ, ভারতশাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তাসম্বন্ধে মহাসভায় একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন। সে প্রস্তাব যথাসময়ে উত্থাপিত করা হইয়াছিল; কিন্তু সম্বাদ আসিয়াছে যে, আপাততঃ মহাসভাকর্ত্তৃক তাহা স্থগিত রহিল। এই সম্বাদে আমরা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই, কারণ যাহাদের জন্য মিঃ স্লাগের এত যত্ন এবং উদ্যোগ, তাহারাই যখন এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন এবং নিদ্রিত, তখন তিনি যে কেবলমাত্র আপনার কিম্বা আপন সহযোগী কয়েকজন সহানুভব বন্ধুদিগের মতে বলীয়ান হইয়া সহসা এমন একটী

বৃহৎ কার্য্যে সফল হইবেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, বিলাতপ্রবাসী ভারতসন্তানেরা বিলাতে ভারতবর্ষসম্বন্ধীয় সকলপ্রকার প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তার আন্দোলন করিবার জন্য আপনাদিগের মধ্যে একটী দল বাঁধিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য অতি মহৎ এবং সাধুবাদের উপযুক্ত, ইহা কে অস্বীকার করিবে? যদি ভারতবর্ষের লোকেরা এই দলটিকে মুখপাত্র এবং মধ্যস্থ করিয়া মিঃ স্যাগের ন্যায় ইংলণ্ডবাসী ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদিগের সঙ্গে ক্রমশঃ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদিগের যে বিশেষ উপকার হয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ যে কখন ঘটিবে, তাহা আমরা আশা করিতে সাহসী নহি। বিলাতস্থ ভারতবাসীরা আপনাদিগের প্রতিষ্ঠিতদলের ব্যয়নির্ব্বাহার্থে ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যে সাহায্য তাঁহারা চাহিয়াছিলেন, তাহা অতি সামান্য—বাৎসরিক দুই সহস্র টাকামাত্র। কিন্তু বলিতেও লজ্জা করে, এই সামান্য টাকারও যোগাড় সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে হইয়া উঠিল না! আমরা কোন দিন শুনিব যে, তাঁহাদের উক্ত সভাটী কেবলমাত্র অর্থাভাবে উঠিয়া গিয়াছে। হা ধিক্! ভারতবর্ষ, ভারতবাসী, এবং ভারতের সমস্ত রাজামহারাজাদিগকে ধিক! বাৎসরিক দুই সহস্র টাকা অতিসামান্য কথা। বিংশতি কোটী ছাড়িয়া দাও, বিংশতি সহস্রমাত্র লোকের যদি প্রত্যেকে দুই আনা করিয়া পয়সা দেয়, মুহূর্ত্তমধ্যে দুই হাজার টাকার অনেক অধিক সংগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু এই সংগ্রহ-কার্য্যটীর ভার লয় কে? দুই সহস্র লোককেও এক অভিপ্রায়ে এবং এক উদ্দেশ্যে চালিত করে, এমন লোক ভারতবর্ষে এখনও হয় নাই। নামমাত্র-অধিনায়কের কমি নাই, এবং উচ্চ উচ্চ বাক্যসম্বলিত প্রস্তাবনারও অভাব নাই। সভা, বক্তৃতা, এবং 'বেজলিয়ুসনের' জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িতে হইয়াছে! কিন্তু এক অন্তর্নিহিত নিকৃষ্ট স্বার্থপরতাতেই সকলই মাটী হইল। সকলেই আপনাপন স্বার্থে অন্ধ, সকলেই আপনার 'নাম জাহির' করিতে ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু পরস্পরের গুণগ্রাহী হইয়া এবং দোষ উপেক্ষা করিয়া যে মিলিত হইব, এমন চেষ্টা কিম্বা প্রবৃত্তি কাহারও নাই। সমস্ত দেশ, সমস্ত সমাজ যেন কেমন এক প্রকার অলৌকিক নারকীয় বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ।

বৈশাখে বাঙ্গালাদেশে যে কেবল বর্ষের পরিবর্ত্তন ও ঋতুর পরিবর্ত্তন তাহা নহে। প্রধান রাজপুরুষদিগের স্থান ও কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন। গ্রীষ্মের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই রাজপুরুষদিগের পর্ব্বতশৃঙ্গে তিরোভাব—তাঁহারা শীতেও 'ঠাণ্ডা', গ্রীষ্মেতেও 'ঠাণ্ডা'। কিন্তু প্রজালোকের বারমাসই প্রাণান্ত। বৈশাখ হইতে আরম্ভ হইয়া কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত বসন্ত, বিসূচিকা, 'ম্যালেরিয়া' প্রভৃতি ভয়ানক উৎকট পীড়াসমস্ত দেশমধ্যে বিরাজ করে। ইহাদের দ্বারা যে কত প্রাণহানি হয়, কত গৃহ লোকশূন্য হয়, কত স্ত্রী বিধবা হয়, এবং কত পুত্রকন্যা অনাথা হয়, তাহা একমাত্র ঈশ্বরই অবগত আছেন! গতবৎসর বাঙ্গালাদেশের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ সমস্ত বেহার-প্রদেশে যেরূপ শস্যহানি হইয়াছে, তাহাতে দুর্ভিক্ষেরও বিলক্ষণ আশঙ্কা করা যায়। বেহার-অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্যাদি যেরূপ দুর্মূল্য হইয়াছে, তাহাতে

যে শ্রমজীবিলোকদিগের মধ্যে অনহাবে প্রাণহানি হইতেছে না, ইহাব প্রমাণ কি ?

গতমাসেব ঘটনাসকলেব মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়েকটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।—

১। স্থানীয় আত্মশাসনবিধি। এই আইনেব নূতন পাণ্ডুলিপি সম্প্রতি গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। দুই বৎসব অতীত হইযা গিযাছে, লর্ড বিপণ সমগ্র ভাবতবর্ষে এই স্থানীয় আত্মশাসন-প্রথা প্রবর্ত্তিত কবিবাব প্রস্তাব কবিযাছেন। মান্দ্রাজ, বোম্বাই, উত্তর পশ্চিম প্রভৃতি সমস্ত প্রদেশেই একে একে পৃথক্ পৃথক্ আইন জাবি হইযা গিযাছে, কিন্তু আমাদের বাঙ্গালা প্রদেশ নাকি শুনিতে পাই সমুদয় ভাবতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ও উন্নত, তাহাতেই ইহাতে এপর্য্যন্ত উক্ত প্রথা প্রচলিত হইল না! ইহা আমাদেব অদৃষ্টেব দোষ বলিতে হইবে! বাঙ্গালাব বাজপুরুষেবা বড়ই উপযুক্ত লোক, এবং বাজনীতি শাস্ত্রেও তাঁহাদের ব্যুৎপত্তি যথেষ্ট, তাহাতেই তাঁহাদিগকে অনেক চিন্তা, অনেক বিবেচনা, এবং অনেক গবেষণা কবিতে হইতেছে। বাঙ্গলাদেশে অনেকগুলি লোক শিক্ষিত হইয়া উঠিযাছেন, এবং সেই শিক্ষাব ফলে তাঁহাদেব আশাভবসাও বর্দ্ধিত হওযাতে তাঁহারা আজকাল সকল কথাতেই নূতন নূতন স্বত্ব এবং স্বাধীনতা প্রার্থনা করিয়া থাকেন। সুধু প্রার্থনা নহে, আবার কখন কখন রাজপুরুষদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইযা কলহ এবং বচসা করিতে ও ত্রুটী কবেন না। বাঙ্গালাব রাজপুরুষমহোদয়েবা ইহা আদৌ পছন্দ করেন না, এবং যাহাতে এরূপ জাতীয স্ফূর্ত্তিবৃদ্ধি না পাইয়া ববঞ্চ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়েই তাঁহারা সর্ব্বদা যত্নবান। সুতরাং আত্মশাসনবিধি কি প্রকারে বাঙ্গালায প্রচলিত হইবে, সেজন্য তাঁহাদিগকে অত্যন্ত চিন্তা কবিতে হইতেছে। সেই জন্যই এত বিলম্ব, এবং সেই জন্যই, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নত হইয়াও, বাঙ্গালা এবিষয়ে অপবাপর প্রদেশেব অপেক্ষা পশ্চাৎপদ হইযা পড়িযাছে। কিন্তু কেন যে রাজপুরুষগণ এত চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন হযেন, তাহা এপর্য্যন্ত আমবা বুঝিতে পাবিতেছি না। 'আত্মশাসন' কথাটী শুনিলেই বোধ হয, যেন গবর্ণমেণ্ট আমাদিগেব হস্তে কত শাসনক্ষমতা প্রদান কবিতে প্রস্তুত হইযাছেন। কিন্তু বিষযটী ভাল কবিযা চিন্তা কবিযা দেখিলে বোধ হয যে, "সর্ব্বৈব ফাঁকি"। শাসনসম্বন্ধে প্রকৃতপ্রস্তাবে এক কপর্দ্দক ক্ষমতাও আমাদিগকে প্রদত্ত হইবে না, কেবল শত শত ক্রোব বাজস্ব যাহা আদায হইযা থাকে, তাহাবই কিযদংশমাত্র আমাদিগেব হস্তে খবচ কবিবাব জন্য দেওযা হইবে। তাহাতেও কি আমাদেব সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে? তাহা নহে। আমবা কেবল 'বেগাবী' কবিব মাত্র, আমাদেব পশ্চাৎ পশ্চাৎ আবাব জেলাব মাজিষ্ট্রেট হইতে প্রদেশীয ছোট লাট পর্য্যন্ত অহবহঃ লাগিযা থাকিবেন। একটু পদস্খলন হইলে, একটু নিযমেব ব্যতিক্রম হইলে, তখনই আমাদের মস্তকে মুদ্গরাঘাত হইবে। ইহাই স্থানীয় আত্মশাসন।—যাহা এত ধুমধাম ও ঢক্কাবাদনের সহিত ইংবাজ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগেকে প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন!

২। ভারতবর্ষে বহুবিস্তৃত রেলপথ প্রস্তুত করণের ঔচিত্যানৌচিত্য স্থির করিবার জন্য আজকাল পার্লিয়ামেণ্টের একটী কমিটি

বসিতেছে। পার্লিয়ামেণ্টের কয়েকজন বিশেষ দক্ষ এবং অভিজ্ঞ মেম্বর এই কমিটির সভ্য হইয়াছেন। বিলাতস্থ অনেক রাজকর্ম্মচারী এবং স্বাধীন ব্যবসায়ী লোকদিগের 'সাক্ষ্য' লওয়া হইতেছে। তদ্ভিন্ন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট হইতেও দুইজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী তদভিপ্রায়ে প্রেরিত হইয়াছেন। এক্ষণে কমিটির কার্য্য চলিতেছে, সমস্ত সাক্ষ্যগ্রহণ সমাপ্ত হইলে, তাহারা আপন মন্তব্য প্রকাশ করিবেন। ভারতবাসী কোন ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছেন কি না, আমরা তাহা শুনিতে পাই নাই। কিন্তু ব্রিটিশরাজ্যের কার্য্যপ্রণালী যেরূপ, তাহাতে ইহা সম্ভবও নহে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট নিজে 'সর্বজান্তা', কোন বিষয়েই তাঁহাদিগকে দেশীয়দিগের মতামতের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। কিন্তু তাঁহাদের এই ঔদ্ধত্যের ফল এই হয় যে, তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত প্রায় সকল বন্দোবস্তেই আমাদের প্রাণান্ত হইয়া উঠে।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট শতাধিক বৎসর রাজত্ব করিয়া ভারতবর্ষে আজপর্য্যন্ত দশহাজার মাইলের অধিক রেলওয়ে বসাইতে পারেন নাই। রাজস্ব যেরূপ বিপুল, দেশ যেরূপ প্রশস্ত এবং দেশের অভাবও যেরূপ অসীম, তাহাতে সকলের মতে এবং অপরাপর দেশের তুলনায়, এই দশহাজার মাইল কিছুই নহে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের সঙ্গেই এখন ভারতবর্ষের সংস্রব জন্মিয়াছে। ভারতবর্ষের স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। যে যতই ইহার সহিত বাণিজ্য এবং ব্যবসায়-সূত্রে সংস্রব সংবর্দ্ধিত করিবে, ততই তাহার উপকার হইবার সম্ভাবনা। পৃথিবীর অপরাপর দেশের লোকেরা, বিশেষতঃ ইংরাজেরা, এই কথাটী বেশ জানেন, এবং সমস্ত দেশটী যথেষ্টরূপে রেলওয়ে দ্বারা আচ্ছন্ন না হইলে নাকি সেই বাণিজ্য এবং ব্যবসায়ের সুবিধা হয় না, সেই জন্যই আজকাল রেলওয়ের অভাব সম্বন্ধে এরূপ আন্দোলন উত্থাপিত করিয়াছেন। দেখা যাউক, এই আন্দোলনের ফল কিরূপ হয়।

আমাদের দেশের পুরাতন এবং বৃদ্ধলোকেরা আজপর্য্যন্ত বলিয়া থাকেন যে, রেলওয়েতেই আমাদের সর্ব্বনাশ করিল, আজকাল ইংরাজরাজত্বে সাধারণ প্রজাবর্গের যে এত কষ্ট হইয়াছে, এক রেলওয়েই তাহার মূলীভূত কারণ। ভারতহিতৈষী কোন কোন উপযুক্ত ইংলণ্ডীয় লেখককেও সময়ে সময়ে আমরা এরূপ মত প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। তাঁহারা বলেন, ভারতবর্ষের পক্ষে, এক একটী রেলওয়ে এক একটী শোণিত-নিঃসরণকারী শিরা। রেলওয়ে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার একটী প্রধান অঙ্গ এবং দেশের প্রকৃত উন্নতির পরিচায়ক, এ বিষয়ে কুত্রাপি কোনপ্রকার মতভেদ আছে আমাদের এমন বোধ হয় না। কিন্তু তথাপি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইহা অপকারী কেন? 'পোড়া দেশের কি সবই বিট্‌কেল'? অন্যের পক্ষে যাহা ভাল এবং মঙ্গলপ্রদ, আমাদের পক্ষে তাহা অনিষ্টকর? যাহা-হউক এ প্রকার হইবার একটী প্রধান কারণ আছে। এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যত রেলওয়ে খুলিয়াছে, তজ্জন্য বাস্তবিকই আমাদের কষ্ট হইয়াছে। দেশের অভ্যন্তরে যত শস্যাদি উৎপন্ন হয়, এই রেলওয়েকর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ তাহা দেশান্তরে প্রেরিত হয়, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দ্রব্যাদির মূল্য বর্দ্ধিত হইয়া যায়। এই মহার্ঘ্য তখন চিরস্থায়ী হইয়া পড়ে, এবং তাহার ফলে দেশের সাধারণ লোক-

দিগের কষ্ট উপস্থিত হয়। এস্থলে কথা হইতে পারে যে, যেমন একপক্ষে রপ্তানি দ্বারা দ্রব্যের মূল্য অধিক হয়, অপরপক্ষে তেমনি শস্যাদি অধিক মূল্যে বিক্রীত হওয়াতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আয়ও হয়। অতএব কষ্টের কারণ কি? কিন্তু আমরা বলি, এই মূল্য বেশী হইবার যে উপকার তাহা সাধারণ লোকের, অর্থাৎ যাহারা শস্য উৎপন্ন করে তাহারা, যৎসামান্যই পাইতে সমর্থ হয়। তাহাদের অবস্থা চিরকালই সমান—"দিন আনে, দিন খায়"। তাহারা জমির খাজনা, মহাজনের দেনা এবং পরিবারদিগের ভরণ-পোষণের জন্য সর্ব্বদাই এরূপ ব্যস্ত যে দুইদিন রাখিয়া জিনিষ বিক্রয় করিতে পারে না; মাঠে শস্য তৈয়ার হইবামাত্র যে মূল্য পায়, তাহাতেই তৎক্ষণাৎ তাহা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। শ্রমজীবিলোকদিগের ত এই অবস্থা। তাহার পর, তাহাদিগের উপর একশ্রেণীর লোক আছে, তাহারা এই সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া রেলওয়ে দ্বারা বড় বড় গঞ্জ কিম্বা বন্দরে লইয়া যায়। তাহারা কিছু লাভ পায় বটে, কিন্তু প্রায়ই সকলে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া এবং অল্প মূলধন লইয়া কার্য্য করে বলিয়া, তাহাদেরও যৎসামান্যমাত্র লাভ হইয়া থাকে। এইরূপ অসংখ্যসংখ্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়দার আমাদের দেশে আছে, কিন্তু তাহারা সকলেই পূর্ব্ব হইতে ইংরাজবণিকদিগের—যাঁহারা কলিকাতা কিম্বা বোম্বাইতে জাহাজ লইয়া বসিয়া থাকেন তাঁহাদের—নিকট হইতে 'দাদন' লইয়া বাধ্য হইয়া থাকে। একটাকার জিনিষ বিনাবাক্যব্যয়ে তাহাদিগকে বারআনায় পঁহুছাইয়া দিতে হয়। আমাদের দেশের ব্যবসায়বাণিজ্যের অবস্থা ঠিক এইরূপ, তবে লক্ষের মধ্যে দুইজন যদি বড় ব্যবসায়দার থাকে, তাহাদিগকে আমরা হিসাবের মধ্যে লই না। কিন্তু এরূপ অবস্থায়, রেলওয়ে কর্ত্তৃক, আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের প্রশস্ততা সাধিত হইলে দেশবাসীরা তাহা হইতে কি উপকার প্রাপ্ত হইতে পারে?—কিছুই নহে। আমরা চিরকালই 'মজুরের জাতি', পূর্ব্বে তাহাও কম ছিল, এখন না হয় সেই 'মজুরি' কার্য্যের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু অপরপক্ষে বৃদ্ধির রপ্তানি জন্য দরিদ্রলোকদিগের যে কষ্টবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা আর কে অস্বীকার করিবে? এই জন্যই রেলওয়ে আমাদিগের পক্ষে অনিষ্টকর। রেলওয়েবৃদ্ধি হইলে, উৎপন্ন দ্রব্যাদির যে চলাচল হয় এবং তন্নিবন্ধন জাতীয় ধনের যে সমধিক উন্নতি হয়, তাহা সত্য, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত প্রশস্তরূপে ব্যবসায়বাণিজ্য করিয়া সেই চলাচলকার্য্য আমরা নিজে না করিতে পারিব, ততদিন তাহা হইতে যে প্রকৃত লাভের সম্ভাবনা, তাহা কিছুতেই আমরা প্রাপ্ত হইব না। এখনই আমাদের কষ্টের অবধি নাই; পরে যে কি হইবে, তাহা মনে করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

৩। পরিবর্ত্তিত নূতন রেণ্টবিল। গবর্ণমেণ্টের অনেকগুলি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর এবং বিশেষতঃ আমাদের ছোটলাট টমসন বাহাদুরের পূর্ব্ব হইতেই এরূপ আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, এই বৎসরের সেশনেই প্রস্তাবিত রেণ্টবিলটী "পাশ" হইয়া যায়। কিন্তু, জমিদারদিগের নিরবচ্ছিন্ন একত্রীভূত চেষ্টায় তাহা হইতে পাইল না। ভালই হইয়াছে; আইনটী যেরূপ গুরুতর, তাহাতে ইহাতে যে কোন প্রকার অবথা তাড়াতাড়ি

হইতে পাইল না, ইহা খুব সুখের বিষয়। আইনটী নির্ব্বাচিত কমিটিতে একমাস দেড়-মাস ধরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া বিবেচিত এবং বিচারিত হইয়াছে; এবং তাহার ফলে যথেষ্টরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া, পুনরায় নূতন আকারে গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। এই নূতন পাণ্ডুলিপির উপর সাধারণের মতামত চাওয়া হইয়াছে, আগামী নভেম্বর পর্য্যন্ত তাঁহারা সময় পাইবেন; তৎপরে ব্যবস্থাপক সভা কলিকাতায় পুনরাগমন করিয়া এসম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবেন। জমিদার-মহাশয়দিগের সতেজ আন্দোলন এবং একত্রীভূত কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া অমরা বাস্তবিকই যথেষ্ট সুখী হইয়াছি, অশেষ ধন-সম্পত্তির সম্ভোগে বিহ্বল হইয়া কেবলমাত্র আলস্যে এবং উদাসীনতায় কালাতিপাত করা এতকাল যাঁহাদিগের অভ্যাস ছিল, স্বার্থ-হানির ভয়ে তাঁহারা যে একেবারে হঠাৎ এতদূর উদ্যুক্ত হইয়া উঠিতে পারিয়াছেন, ইহা দেশের এবং সমাজের পক্ষে একটী অতি শুভ লক্ষণ। এক্ষণে আমাদের প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা উদারভাব চক্ষুতে নূতন পাণ্ডুলিপিটী সন্দর্শন করেন এবং তাহা আইনে পরিণত হওয়া সম্বন্ধে আর অন্যায় বাধা প্রদান না করেন। প্রস্তাবিত আইনের দ্বারা তাঁহাদের কোন প্রকার ক্ষতি হয়, ইহা কাহারও ইচ্ছা নহে; কিন্তু তাই বলিয়া যে আইনটী একবারেই প্রয়োজনীয় নহে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। দেশের যেমন যেমন অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতেছে, এবং সাধারণ প্রজাবর্গের যেমন যেমন নূতন অভাব-সৃষ্টি হইতেছে, তদনুরূপ তাহাদিগকে স্বত্বস্বাধীনতা দিতেই হইবে। ইহা অপরিহার্য্য। সুতরাং ইহাতে বাধা-প্রদান করিলে, সে বাধা যে চিরকালই কার্য্যকরী হইবে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। এক্ষণে দেখা যাউক, নূতন পাণ্ডুলিপির কিরূপ পরিণাম হয়। জমীদারমহাশয়েরা ত ভারতবর্ষ হইতে বিলাত পর্য্যন্ত যোগাযোগ করিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু 'গরিব' প্রজার পক্ষে এক ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ নাই।

—

৪। বিগত-মাস হইতে "বঙ্গবাসী" এবং "সঞ্জীবনী" নামক দুই বাঙ্গালাসংবাদপত্রে অতি চমৎকার বাগ্‌যুদ্ধ চলিতেছে। বঙ্গবাসী এবং 'সঞ্জীবনী' উভয়েই বিশেষ প্রতিষ্ঠালব্ধ সম্বাদপত্র; বাঙ্গালার অধিকাংশ শিক্ষিত লোক এবং স্কুলের ছাত্রেরা ইহা পাঠ করিয়া থাকেন, এবং উভয়েরই কার্য্যকারিতার উপর আমাদের সমাজের অনেকমঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিয়া থাকে। এমন অবস্থায় তাঁহারা যদি 'পাড়াগেঁয়ে' লোক কিম্বা অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় পরস্পরের সঙ্গে অযথা এবং কুরুচিসম্পন্ন কলহে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে আমাদের সমাজের উন্নতির আশা কোথায়? 'বঙ্গবাসীই' প্রথমে এই কলহের সূত্রপাত করেন, তিনি ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন এবং তাহার কতিপয় প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কতকগুলি নিন্দাবাদ করেন; 'সঞ্জীবনী' তাহার প্রতিবাদ করেন; প্রথমে 'সোজাসুজি' তর্কবিতর্ক হইতে হইতে ক্রমে কলহটী পাকিয়া দাঁড়াইতেছে। সাধারণ সম্বাদপত্রে ব্যক্তিগত ঈর্ষা পরিতৃপ্তির জন্য অপরের কুৎসা এবং গ্লানি করিতে কেহ সাহসী হয়েন, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। একে ত নানাবিধ কলহ এবং দলাদলীদ্বারা আমাদের সমাজ শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; তাহার উপর আবার নূতন করিয়া গৃহবিচ্ছেদ কেন?

হঃ মঃ।

নানা কথা।

১২৯১ সালের গুপ্তপ্রেশ-পঞ্জিকা প্রকাশিত হইয়াছে। গণনার বিশুদ্ধতায়, মুদ্রাঙ্কনের পারিপাট্যে এবং সুচিত্রসমাবেশে গুপ্তপ্রেশ-পঞ্জিকা আজিকালি বঙ্গীয় সমস্ত পঞ্জিকার আদর্শ হইয়াছে। সংবাদ-পত্র-সম্পাদকগণ এই পঞ্জিকার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আমরা এই উৎকৃষ্ট পঞ্জিকা অধিকতর উৎকৃষ্টাকারে প্রকাশিত হয়, এরূপ অভিলাষ করি। এইজন্য আমরা প্রস্তাব করি, ভারতবর্ষের ডিরেক্টরী পঞ্জিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়া বাবু দুর্গাচরণ গুপ্ত উহার কলেবর বর্দ্ধিত করুন। এই পরমোপকারী অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের সমাবেশে পঞ্জিকার মূল্য অবশ্যই কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে হইবে, কিন্তু গ্রাহকগণের তাহাতে অসন্তুষ্টি-প্রকাশের কোনও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। যেহেতু এই সামান্য-বর্দ্ধিতমূল্য প্রদান করিয়া তাঁহারা এক সুবিস্তীর্ণ নূতন বিষয় অবগত হইতে সক্ষম হইবেন। বহুদিন হইল, বাবু বিহারিলাল নন্দী বাঙ্গলাভাষায় ডিরেক্টরীসংবলিত এক সুবৃহৎ উৎকৃষ্ট পঞ্জিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু বটতলার পঞ্জিকাকারগণ তাঁহার সেই মহদুদ্দেশ্য বিফলীকৃত করিয়াছে। তাহারা বিহারিবাবুর নবপ্রকাশিত উৎকৃষ্ট পঞ্জিকার অধিকতর গ্রাহক দেখিয়া আপনাদিগের অপকৃষ্ট পঞ্জিকায়ও স্বল্পপরিমাণে ডিরেক্টরী নিবেশিত করিতে আরম্ভ করিল এবং অতিৎসামান্য মূল্যে তাহা সাধারণসমক্ষে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিল। সর্ব্বসাধারণ স্বল্পমূল্যে সুবৃহৎ বটতলার 'পাঁজি' পাইয়া, আর অধিক মূল্যে বিহারিবাবুর পঞ্জিকাগ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন না। বিহারিবাবুও তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট-পঞ্জিকা-প্রকাশে বিরত হইলেন। এইরূপে বটতলার মুদ্রাপ্রেতগণকর্ত্তৃক বাঙ্গলার একটী মঙ্গলময় সদনুষ্ঠান বিলুপ্ত হইল। এক্ষণে সেই অভাব পূরণ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। বঙ্গবাসী, বটতলার কদর্য্য পঞ্জী পরিত্যাগপূর্ব্বক, গুপ্তপ্রেশের পক্ষপাতী হইয়াছে। আমরা আশা করি, এই সুযোগে বাবু দুর্গাচরণ গুপ্ত তাহার পঞ্জিকার কলেবর বৃদ্ধি করিয়া উহার সহিত ডিরেক্টরী সংযোজিত করিলে বিশেষ লাভবান্ হইবেন এবং তাহা হইলে গুপ্তপ্রেশ-পঞ্জিকা এক্ষণে যেরূপ আদৃত হইতেছে, জনসমাজে তদপেক্ষা অধিকতর সমাদৃত হইবে, বঙ্গদেশের একটী অভাব বিমোচিত হইবে এবং বঙ্গভাষার প্রসার বর্দ্ধিত হইবে। কারণ সামান্য মূল্যে ডিরেক্টরী পাইলে কেহই ১৲ টাকা মূল্যপ্রদানপূর্ব্বক থ্যাকারের বৃহৎ ডিরেক্টরি ক্রয় করিতে অগ্রসর হইবেন না। গুপ্তপ্রেশ-পঞ্জিকায় এক্ষণেও নানা অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ হইয়া থাকে; ডিরেক্টরী সংবলিত হইলে উহা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইবে। এবং পঞ্জিকার শেষভাগে কয়েকখানি পত্র ডায়েরিস্বরূপ সংযোজিত করিয়া দিলে গৃহস্থলোকদিগের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলি লিখিয়া রাখিবার পক্ষেও পরমোপযোগী হইবে।

মানুষভূত ও গোভূতের কথা অনেক শুনা গিয়াছে, কিন্তু কুকুরভূত, বিড়ালভূতের কথা বোধ হয় কেহ কখন শুনেন নাই।

পুণার এক খানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছে যে, তথায় সংপ্রতি একটী কুকুর-ভূত দেখা দিয়াছে; ইহার অত্যাচারে অনেকে জলাতঙ্ক (Hydrophobia) রোগে মরিয়াছে। এই ভূতকে হত্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু সে সর্পাকার ধারণ করিয়া ঘাতকের উদ্যম ব্যর্থ করিয়াছে। এই সারমেয়প্রেত এক প্রকার বহুরূপী। ইহা দ্বাদশপ্রকার রূপধারণ করিয়া থাকে।

মশকজাতি ৩০। ৩৫ সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মশকীরা জলে ডিম্ব পাড়ে, ডিমগুলি যেমন গর্ভ হইতে নিঃসৃত হয়, অমনি পাশাপাশি হইয়া লাগিয়া যায়। এইরূপে ২৫০। ৩০০ ডিমে একখানি গোলমত ভেলা নির্ম্মিত হয়। ভেলা জলে ভাসিয়া থাকে, ওদিকে ডিমগুলি ফুটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট বাহির হয়। মশকশিশুরা ১০। ১৫ দিন জলে থাকিলে পর, তবে উহাদের পাখা উঠে। তখন উহারা উড়িতে শিখে। এজন্য আমরা পুরাতন জলের জালা হইতে, পুষ্করিণী হইতে, মশক উড়িতে দেখি, আর এইজন্যই অনেকে বলিয়া থাকেন, মশক স্বেদজ-জীব,—পূতিগন্ধময় দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয়। বাস্তবিক তাহা নহে, ইহা পক্ষিজাতির ন্যায় অণ্ডজ।

"ত্রিপুরা-বার্ত্তাবহ" বলেন যে, একদা ফরাসীদেশের দক্ষিণ সীমাতে কোন গৃহস্থের একভ্রাতার একটী পুত্র এবং অন্য ভ্রাতার একটী কন্যা হয়। এই পুত্রকন্যা অতি-অল্প-বয়সেই যৌবনে উপনীত হয়! কন্যা সাত এবং পুত্র আট বৎসর বয়সেই সন্তানের মুখ দর্শন করে!! অর্থাৎ এই বালকের ঔরসে ঐ বালিকার সন্তান হয়!!! আমাদিগের আগে এরূপ অপ্রাকৃতিক ঘটনা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তিই হইত না। এখন দেখিতেছি, পৃথিবী অপ্রাকৃতিক; কল্কী-অবতারের কথা শুনিয়া কেহ হাসিবেন না।

এদেশীয় কোন রাজার জন্য বার্ম্মিংহাম নগরে একখানি বহুমূল্য সিংহাসন স্ফটিকে নির্ম্মিত হইতেছে। আসনের নিম্নে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়া দিলে সিংহাসনখানি বৃহৎ এক খণ্ড হীরকের ন্যায় জ্বলিতে থাকিবে। আমাদের দেশের রাজারা এখন এত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন যে, আর হীরকখচিত আসন প্রস্তুতের শক্তি না থাকায়, কৃত্রিম হীরক দ্বারা 'দুধের আশা' জলে পুরাইতেছেন!

প্রধান প্রধান সৈনিক অফিসার-সম্বলিত রুশিয়ার সমগ্র সৈন্যসংখ্যা ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার ২০৯ জন। তন্মধ্যে সেণ্ট্ পিটর্স-বর্গে ৮২ হাজার ৪৭০ জন, ফিন্‌লাণ্ডে ১৩ হাজার ৪৪৫ জন, উইল্‌নাতে ১ লক্ষ ৪ হাজার ৩৬৬ জন, ওয়ার্সাতে ১ লক্ষ ১০ হাজার ২৮৭ জন, কিয়েফ্ ৫৩ হাজার ৬৮৪ জন, ওডেসাতে ৬৩ হাজার ৪৩৩ জন, খারকফে ৬৩ হাজার ১৪৬ জন; মস্কোতে ৮৪ হাজার ৪৩৫ জন, কাজানে ৩৯ হাজার ৮২৬ জন, ককেশসে ৯৯ হাজার ৫৮ জন, তুর্কিস্থানে ২৬ হাজার ৬৭৯ জন।

এডুকেশন গেজেটে ইংরাজ-জীবনের এই রূপ বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে:—"প্রথমতঃ শয্যা হইতে উঠিয়াই বাল্যভোগের নিয়ম। তাহাতে উপাদেয় চা, রুটী মাখন প্রভৃতি 'বরাদ্দ'। সোডা দিয়া ব্রাণ্ডি খাইবারও প্রথা আছে। তাহার পর প্রায় দশটার সময়

পারণ বিধি—তাহার অঙ্গ অন্ততঃ চারিটী কবোষ্ণ ব্যঞ্জন, মাংস, নানাবিধ ফল, পিষ্টক, চা, কাফি, ক্লারেট। সচরাচর প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া এই ভোগের ব্যাপার চলিয়া থাকে। যাহারা শিকার করিতে যাইবে, তাহাদের পক্ষে পারণ বিধি কিছু সকাল সকাল নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ভোজনের টেবিল উষ্ণ শীতল নানাবিধ পশ্বাদির মাংস ও পক্ষিমাংসে সাজান হয়। কাফি সচরাচর তিনটার পর খাওয়া হয়। মহিলারা প্রায় পাঁচটার সময় চা-ভক্ষণ করেন। তৎপর নৈশ-ভোজন। উহা সচরাচর রাত্রি প্রায় আট-নয় ঘটিকার সময় আরম্ভ হয়। এই আহার সময়ে ফুলের ব্যাপারের পারিপাট্যই বা কত। এক একটী ভোজক্ষেত্রে ফুলের বোঝা বহিতে মালীর ঘাড় ভাঙ্গিয়া যায়। প্রায় দশটা সাড়ে দশটার সময় নৈশ ভোজন সমাধা হয়। তাহার পর ভোজনগৃহে কাফি আনিয়া পড়ে, পুরুষদিগের ধূমপান চলিতে থাকে এবং কোন কোন স্ত্রীলোকও চুরটসেবন করিয়া থাকেন। তৎপরে শয্যায় গমন পর্য্যন্ত সুরা এবং চার ব্যাপার চলে। সোডা-ওয়াটার, লেমনেড্, হুইস্কি, ব্রাণ্ডি, ক্লারেট প্রভৃতি বিবিধরূপ পানীয়ের ব্যবস্থা আছে। আহারের ব্যাপার ত উপরি-উক্তরূপ নানাপ্রকার ধূমধামে চলে। পরিচ্ছদের ব্যাপারও ততোধিক। উহার বাহুল্য ও বহুব্যয়ের কথা আর কি বলিব? এক্ষণকার রমণীরা তাহাদের মাতামহীদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক এবং মাতাদিগের অপেক্ষাও অধিক ব্যয় করিয়া থাকে। এমন অনেক স্ত্রীলোক আছে, যাহাদের বৈভব অধিক নয়, তাহারাও বৎসরে পরিচ্ছদে ৬০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া থাকে। বৎসরে কেবল পরিচ্ছদের জন্য দশ হাজার টাকা ব্যয় করে, এমন স্ত্রীলোকও অনেক আছে। একটী 'মজলিশি' পোষাকের জন্য ৬৩০ টাকা অনিয়ত ব্যয় নহে! ঘণ্টায় ঘণ্টায় পোষাক পরিবর্ত্তন হয়। এক সন্ধ্যা কালেই তিনবার পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ইহার স্বাভাবিক ফল এই হইতেছে যে, যুবা পুরুষেরা সহসা আর বিবাহ করিতে চাহে না। ধনী হইতে না পারিলে, তাহাদের বিবাহ করিতে সাহস হয় না। এই কারণে বিবাহ কমিয়া যাইতেছে এবং পরিবার ক্ষয় হইতেছে। লণ্ডনে নানা কারণে এত ব্যয়বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে যে, গাড়ি ঘোড়া রাখিয়া একজন ভদ্রলোকের মাসিক হাজার টাকার কমে মান বাঁচাইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা ভার হইয়া উঠিয়াছে। লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ানও মহাধূমধামের ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। একটী ভোজস্থলে কখন কখন ২০ হাজার টাকা কেবল ফুলের নিমিত্ত খরচ হয়। সমুদ্রের ধারে বাস করা একটী 'বড়-মানুষী কেতা' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমুদ্রের ধারে বাস করিতে জমির খাজনা বা বাটীভাড়া প্রভৃতিতে অনেক ব্যয় হইয়া থাকে। ইদানীং অনেক লোক 'বড় মানুষ' হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদের ঐ প্রকার ব্যয় বাহুল্যের নিমিত্ত কষ্টবোধ হয় না। কিন্তু যে সাধারণ লোককে সমাজ বলে, তাঁহাদের বড় কষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধূমপানের ব্যাপারও বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছে। এক এক পরিবারে প্রত্যহ ৫০ টাকার পর্য্যন্ত চুরট খরচ হইবার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়।"

পাক্ষিক সমালোচক।

প্রথম খণ্ড।] সন ১২৯১ সাল ; জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় পক্ষ। [অষ্টম সংখ্যা।

ব্যূহ।

ধনুর্ব্বেদ ও যুদ্ধপ্রসঙ্গে ব্যূহরচনার প্রণালী বর্ণন করা আবশ্যক হইয়াছে। তজ্জন্য আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদ, শুক্রনীতি, মহাভারত, নীতিময়ূখ ও কামন্দকীয় নীতিসার প্রভৃতি মহান্ নিবন্ধ হইতে এই ব্যূহপ্রস্তাব সঙ্কলিত হইল।

যুদ্ধকালে ও অভিনির্য্যানকালে যে হয়, হস্তী, রথ ও পদাতিসৈন্যদিগকে বিশেষ বিশেষ প্রণালীক্রমে বিন্যস্ত করা হয় (সাজান হয়), সেই বিন্যাসপরিপাটীর নাম ব্যূহ। এই ব্যূহ অসংখ্য প্রকার হইলেও প্রধান কল্পে ছয় প্রকার। নীতিময়ূখ গ্রন্থকার প্রধানকল্পের ছয়টী ব্যূহ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "যদ্যপন্যে চ শকুড়াদয়ো ব্যূহভেদেনোক্তাস্তথাপ্যেতেষামেবান্তর্ভাবাৎ ষোটেব ব্যূহভেদা জ্ঞেয়াঃ।" যদিও গরুড় প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ ব্যূহ গ্রন্থান্তরে কথিত হইয়াছে, তথাপি সে সকল ব্যূহ এই ছয়প্রকারের মধ্যেই অন্তর্ভূত হয়, সুতরাং ছয় প্রকার ব্যূহই প্রধান, অন্যান্য ব্যূহ এই ছয় প্রকারের শাখা প্রশাখা মাত্র। উক্ত গ্রন্থকার প্রধান ছয় প্রকার ব্যূহের নাম ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

"ব্যূহস্তু মকর-শ্যেন সূচী-শকট বজ্র-সর্ব্বতোভদ্র ভেদাৎ ষোঢ়া। তেষাং বিনিয়োগ উক্তো মহাভারতে।

ব্যূহ ছয় প্রকার। মকর (১), শ্যেন (২), সূচী (৩), শকট (৪), বজ্র (৫), ও সর্ব্বতোভদ্র (৬)। এই ছয়প্রকার ব্যূহের বিনিয়োগ অর্থাৎ কিরূপ স্থলে বা কিরূপ অবস্থায় কোন ব্যূহ করিতে হয়, তাহার ব্যবস্থা মহাভারতে কথিত হইয়াছে। যথা—

"যথাদ্ব্যূহেন মহতা মকরেণ পুরোভয়ে।
শ্যেনেনো ভয় পক্ষেণ সূচ্যা বা ধীর চক্রয়া॥
পশ্চাত্তয়ে তু শকটং পার্শ্বয়োর্বজ্রসংজ্ঞিতম্।
সর্ব্বতঃ সর্ব্বতোভদ্রং ভয়ে ব্যূহং প্রকল্পয়েৎ॥"

যে স্থানে সম্মুখে ভয়, সেস্থানে মকরব্যূহ রচনা করিয়া গমন করিবেক; অথবা শ্যেনব্যূহ কিম্বা সূচীব্যূহ অবলম্বন করিবেক। পশ্চাদ্ভাগে ভয়কারণ উপলব্ধ হইলে শকটব্যূহ এবং পার্শ্বদ্বয়ে বজ্রব্যূহ আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। আর যদি ভয়ের দিঙ্‌নির্ণয় না থাকে, সকলদিকেই ভয় সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বতোভদ্রব্যূহ রচনা করিবেক।

অগ্নিপুরাণোক্ত রণদীক্ষা প্রকরণে কতকগুলি ব্যূহের উল্লেখ আছে যথা—

"গরুড়োমকরব্যূহশ্চক্রঃ শ্যেনস্তথৈবচ।
অর্দ্ধচন্দ্রশ্চ বজ্রশ্চ শকটব্যূহ এব চ॥
মণ্ডনঃ সর্ব্বতোভদ্র সূচীব্যূহস্তথৈবচ॥"

গরুড়, মকর, চক্র, শ্যেন, অর্দ্ধচন্দ্র, বজ্র, শকট, মণ্ডন, সর্ব্বতোভদ্র ও সূচী—অগ্নিপুরাণের মতে এই দশপ্রকার ব্যূহ প্রধান

বলিয়া গণ্য। অগ্নিপুরাণ আরও বলিয়াছেন যে,—

"ব্যূহাঃ প্রাণ্যঙ্গরূপাশ্চ দ্রব্যরূপাশ্চনেকধা॥"

যুদ্ধকালে প্রাণীর অঙ্গের সাদৃশ্য লইয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের গঠন প্রকার অবলম্বন করিয়া অনেক প্রকার ব্যূহ রচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ব্যূহের সংখ্যা কল্পনা করা বা সৈন্য-রচনাকে সীমাবদ্ধ করা অসঙ্গত ভিন্ন সুসঙ্গত নহে। তবে দিগ্দর্শনের নিমিত্ত, সৈন্যরচনার মর্য্যাদা বুঝাইবার নিমিত্ত,নীতিবক্তৃগণ উক্ত-প্রকার সীমাবদ্ধ কথা বলিয়া গিয়াছেন। অগ্নিপুরাণের 'রণদীক্ষা প্রকরণোক্ত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটীর তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে উহাই প্রতীত হইবে। যথা—

"দেশে তদৃশ্যাঃ শত্রূনাং কুর্য্যাৎ প্রকৃতি কল্পনাং।
সংহতান্ যোধয়েদল্পান্ কামং বিস্তাবয়েদ্বহূন্॥"

উপযুক্ত যুদ্ধস্থান অবলম্বন করিয়া, শত্রুগণের অজ্ঞাতসারে, আপনার সৈন্যরচনা করিবেক। অল্পসৈন্য সমবেত হইয়া বহুর সহিত, ইচ্ছা হইলে সংহত অল্পের সহিত, আবশ্যকমতে বহুসৈন্যকেও বিস্তৃত করিয়া যুদ্ধ করিবেক।

ব্যূহরচনার সম্বন্ধে নীতিসার ও নীতিময়ূখ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ব্যূহের সর্ব্বাগ্রভাগে নায়ক অর্থাৎ সেনাপতি অবস্থান করিবেন। অন্যান্য বীরপুরুষ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ করিবেক। পরন্তু তাঁহারা সকলেই সেনাপতির রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন। স্ত্রীলোক, কোষ অর্থাৎ ধনাগার, রাজা, আর কন্তুসৈন্য অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য ও তদ্রক্ষক—ইহাদিগকে ব্যূহের মধ্যস্থলে সংরক্ষণ করা কর্ত্তব্য। যথা—

"নায়কঃ পুরতো যায়াৎ প্রবীরপুরুষাবৃতঃ।
মধ্যে কলত্রং কোশশ্চ স্বামী কন্তু চ যত্নতঃ॥"

হস্তীসৈন্য, অশ্ববোহী, রথারোহী ও পদাতি সৈন্য—এই চতুর্বিধ সৈন্যই ব্যূহে বিন্যস্ত হয়। পরন্তু যে কোন প্রকার ব্যূহ রচিত হউক, সমুদায় ব্যূহেই উক্ত সৈন্য-স্থাপনের এক সাধারণ বিধি আছে। যথা—

"পার্শ্বয়োরুভয়োরশ্বা বাজিনাং পার্শ্বয়ো রথাঃ।
রথানাং পার্শ্বয়োর্নাগা নাগানাঞ্চাটবী বনম্॥"

ব্যূহের উভয় পার্শ্বে অশ্বারোহী থাকিবেক। অশ্বারোহীর পার্শ্বে রথারোহী থাকিবেক। রথের পার্শ্বে হস্ত্যারোহী, এবং হস্তীর পার্শ্বে পদাতি থাকিবেক।

নীতিময়ূখকার বলেন যে, প্রত্যেক ব্যূহে দুই দুই সেনাপতি থাকে। একজন অগ্রণী এবং অন্যজন পশ্চান্নায়ক। ইহাদের একজন অর্থাৎ যিনি অগ্রণী তিনি সম্মুখ, অন্যজন অর্থাৎ যিনি পশ্চান্নায়ক তিনি পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিয়া থাকেন। যথা—

"পশ্চাৎ সেনাপতিঃ সর্ব্বং পুরস্কৃত্য কৃতী বনম্।
যায়াৎ সন্নদ্ধ সৈন্যৌঘৈঃ খিন্নাংশ্চাশ্বাসয়ন্ জমান্॥"

রণদক্ষ সেনাপতি চতুরঙ্গ বল অগ্রগামী করিয়া যুদ্ধোপকরণযুক্ত সৈন্যসমূহের পশ্চাদ্ভাগে গমন ও অবস্থান করিবেন এবং খেদপ্রাপ্ত, পলায়মান ও ভঙ্গোদ্যত সৈন্যদিগকে আশ্বাস প্রদান করিবেন।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যাস্থলে দুই দুই সেনাপতি থাকার কথা বিস্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে, যথা—

"পূর্ব্বং সেনাপতেরগ্রে যানমুক্তম্। অধুনা তু পশ্চাদ্যানম্। মতোজায়তে অগ্রে যাস্যা পশ্চ,যাতাচেতি সেনাদ্বয়মস্তীতি।"

অগ্নিপুরানীয় রণদীক্ষা অধ্যায়ে উপদেশ আছে যে, রাজা এককালে সমস্ত সৈন্য ব্যূহে নিয়োজিত করিবেন না। পাঁচভাগ করিয়া তাহার দুইভাগ পক্ষে, দুইভাগ অনুপক্ষে এবং অবশিষ্ট একভাগ লুক্কায়িত রাখিবেন। আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, কার্য্যসঙ্কট বিবেচনা করিয়া, হয় একভাগ, না হয় দুইভাগ দ্বারা যুদ্ধ করিবেন। অন্য তিনভাগ তাহাদের রক্ষার্থে স্থাপন করিবেন। যিনি রাজা, তিনি যদি স্বয়ং সেনাপত্যে অবস্থিত না থাকেন, তবে তিনি কদাচ যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিবেন না; অন্যূন একক্রোশ দূরে রক্ষিবর্গে পরিবৃত হইয়া পলায়মান যোদ্ধাদিগকে ধারণ করিবেন। যুদ্ধকালে যদি প্রধান সেনাপতি রণে ভঙ্গ দেয়, তবে আর কাহারও রণে থাকা উচিত নহে। সকলেরই আত্মরক্ষার্থে পলায়মান হওয়া উচিত। কি প্রকার নিয়মে ব্যূহমধ্যে সঞ্চরণ করিতে হয়? অগ্নিপুরাণ অপেক্ষা শুক্রনীতিগ্রন্থে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। অগ্নিপুরানীয় ব্যবস্থাটী এইঃ—

" ন সংহতান্ ন বিরলান্ যোধান্ ব্যূহে প্রকল্পয়েৎ ॥
আয়ুধানান্ত সম্পর্কো যথা নস্যাৎ পরস্পরম্।
ভেত্তুকামঃ পরানীকং সংহতৈরেব ভেদয়েৎ ॥
ভেদ রক্ষাঃ পরেনাপি কর্ত্তব্যাঃ সংহতৈস্তথা।
ব্যূহং ভেদাবহং কুর্য্যাৎ পরব্যূহেষু চেচ্ছয়া ॥
গজস্য পাদরক্ষার্থাশ্চত্বারস্তু তথা দ্বিজ।
রথস্য চাশ্বাশ্চত্বারঃ সমাস্তস্য চ চর্ম্মিণঃ ॥
ধন্বিনশ্চর্ম্মিভিস্তুল্যাঃ পুরস্তাচ্চর্ম্মিনো রণে।
পৃষ্ঠতোধন্বিনঃ পশ্চাদ্ধন্বিনাং তুরগা রথাঃ ॥
রথাশ্বাঃ তুরগাঃ পশ্চাদ্রক্ষ্যতব্যাঃ পৃথিবীক্ষিতা।
পদাতি তুরগাশ্বানাং ধর্ম্মকার্য্যং প্রযত্নতঃ ॥
শূরাঃ প্রমুখতো...স্কন্ধমাত্র প্রদর্শনং।
কর্ত্তব্যং ভীরুসংঘেন শত্রু বিদ্রাবকারকম্ ॥
দারয়ন্তি পুরস্তাস্তু ন দেয়া ভীরবঃ পুরঃ।
প্রোৎসাহসত্ত্বেচ রণে ভীরূন্ শূরাঃ পুরঃ স্থিতাঃ ॥
প্রাংশবঃ শুকনাসাশ্চ যে চা জিহ্মেক্ষণা নরাঃ।
সংহত ভ্রূযুগাশ্চৈব ক্রোধনা কলহপ্রিয়াঃ ॥
নিত্যহৃষ্টা প্রহৃষ্টাশ্চ শূরা জ্ঞেয়াশ্চ কামিনঃ।
সংহতানাং হতানাঞ্চ রণাপনয়নক্রিয়া ॥
প্রতিযুদ্ধং গজানাঞ্চ তোয়দানাদিকঞ্চ যৎ।
আয়ুধানয়নং চৈব পত্তিকর্ম্ম বিধীয়তে ॥
বিপুনাং ভেত্তুকামানাং স্বসৈন্যস্য তু রক্ষণম্।
ভেদনং সংহতানাঞ্চ ধর্ম্মিনাং কর্ম্ম কীর্ত্তিতম্ ॥
বিমুখীকরণং যুদ্ধে ধন্বিনাঞ্চ তথোচ্যতে।
দূরাপসরনং চানং সুতৃতস্য তথোচ্যতে ॥
ভেদনং সংহতানাঞ্চ ভেদানামপি সংহতিঃ।
প্রাকারতোরণাট্টালদ্রুমভঙ্গশ্চ সঙ্কাজে ॥
পত্তি ভূর্বিষমা জ্ঞেয়া রথাশ্বস্য তথা সমা।
সকর্দ্দমা চ নাগানাং যুদ্ধভূমিরুদাহৃতা ॥
এবং বিরচিত ব্যূহঃ কৃতপৃষ্ঠদিবাকরঃ।
তথানুলোম শুক্রার্ক দিক্‌পাল মুখমারুতাঃ।
যোধানমুজ্জেয়াৎ সর্ব্বান্ নাম গোত্রাচ দানতঃ ॥"

এই সকল শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, ব্যূহমধ্যে যোদ্ধাদিগকে সংহত (অত্যন্ত একত্রিত) করিবেক না, বিরল অর্থাৎ অত্যন্ত ফাঁক ফাঁক থাকিতেও দিবেক না। অস্ত্রসঞ্চালনের ব্যাঘাত না হয়, পরস্পরের অঙ্গ পরস্পরা ব্যাঁকাবেঁকি না হয়, এরূপ ভাবে যোদ্ধাদিগকে পরিচালন করিবেক।

যখন পরসৈন্যের বা পরকৃতব্যূহের ভেদ করিবার ইচ্ছা হইবে, বা আবশ্যক হইবে, তখন সংহত হইয়া অর্থাৎ বহুসৈন্য একত্রিত হইয়া ও স্রোতের ন্যায় হইয়া ভেদ করিতে হইবে এবং পরসৈন্য যখন

আপন সৈন্যদিগকে অর্থাৎ আপনার ব্যূহকে ভাঙ্গিবার উপক্রম করিবে, তখনও তাহা সংহত হইয়া রক্ষা করিতে হইবে।

এরূপ নিয়মে ব্যূহ করিবে যে, ইচ্ছা করিলে তাহা ভিন্ন ভিন্ন (একটী ভাঙ্গিয়া বহু ব্যূহ) করা যাইতে পারে। অথবা পরব্যূহ ভেদ করা যাইতে পারে। হস্তি সৈন্যের চারিটী করিয়া পাদরক্ষক নিযুক্ত থাকিবেক, রথের জন্য চারিটী অশ্বসৈন্য নিযুক্ত রাখিবেক, তাহাদের জন্য চারিটী করিয়া বর্ম্মধারী তাহাদের রক্ষনার্থ তাহাদেরই সমান ধনুর্দ্ধারী নিযুক্ত থাকিবেক। রণমুখে অর্থাৎ রণাগ্রে চর্ম্ম অর্থাৎ ঢালধারী সৈন্যেরা (সম্মুখে) অবস্থান করিবেন।

তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে ধনুর্দ্ধারী সৈন্য থাকিবেক। ইহাদের পৃষ্ঠে অশ্বারোহী এবং অশ্বারোহীর পৃষ্ঠে রথারোহী রাখিবেক। এবং রথারোহীর পশ্চাদ্ভাগে হস্তিসৈন্য স্থাপন করিবেক।

পদাতিসৈন্য, হস্তিসৈন্য ও অশ্বসৈন্য, ইঁহারা বিশেষ যত্নের সহিত আপন আপন কর্ত্তব্য করিবেন। যাহারা শূর অর্থাৎ উৎসাহী ও নির্ভীক, তাহাদিগকেই সকলের সম্মুখভাগে দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেক ভীরু একত্রিত হইলে ব্যূহ ভাঙ্গিয়া যায়, এ নিমিত্ত ভীরুদিগকে সম্মুখে দিবেক না এবং একত্রিত হইতেও দিবেক না।

যাহারা শূর, তাহারা সম্মুখে থাকিবে। তাহারা ভীরুদিগকেও নির্ভীক ও উৎসাহিত করিতে পারে। এ নিমিত্ত শূরদিগকেই সম্মুখে স্থাপন করিতে হয়।

শূরদিগের বাহ্যিক আকার ও লক্ষণ এই যে যাহারা প্রাংশু অর্থাৎ দীর্ঘাকার যাহাদের দৃষ্টি বক্র, যাহাদের ভ্রূযুগল সংহত যাহারা ক্রোধনস্বভাব ও কলহপ্রিয়, যাহারা সর্ব্বদাই হৃষ্ট থাকে এবং বিপদকালেও যাহারা ক্ষুব্ধ হয় না, এমন সকল ব্যক্তিই শূর।

হত হইলে, আহত হইলে, তাহাদিগকে রণস্থল হইতে অপনয়ন করা, হস্তিদিগকে পানাদি করান, অস্ত্রাদি আনিয়া দেওয়া ইত্যাদি কার্য্যসমূহ পদাতিদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়া থাকে।

চর্ম্মধারীরা শত্রুসৈন্যভেদ, সৈন্যের রক্ষা, সংহতদিগকে বিরল করা ইত্যাদি ইত্যাদি কার্য্য করিবেন এবং ধনুর্দ্ধারীরা শত্রুদিগকে বিমুখ করিবেন অর্থাৎ অগ্রসর হইতে দিবেন না এবং বধীরা শত্রুদিগের ত্রাস উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিবেন।

গজের দ্বারা সংহতের ভেদ, ভেদের সংঘাত এবং প্রাচীর, তোরণ ও অট্টাল প্রভৃতির ভঙ্গসাধন করা কর্ত্তব্য।

বিষম অর্থাৎ বন্ধুর ভূমিতে পদাতিসৈন্যের দ্বারা, সমভূমিতে রথসৈন্যের দ্বারা, জলকর্দ্দমাদিযুক্ত স্থানে গজসৈন্যের দ্বারা যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

এবম্প্রকারে ব্যূহরচনাপূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া এবং অনুকূল বায়ু ও অনুকূল গ্রহ অবলোকন করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিবেক এবং নাম ও গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক নানাপ্রকার উত্তেজক বাক্যে স্বসৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিবেক।

ব্যূহস্থসেনা ও সেনাপতিগণ কি প্রকারে সঞ্চরণ করিবেন, কিরূপেই বা যুদ্ধ করিবেন, তত্তাবৎ বৃত্তান্ত শুক্রনীতির সপ্তম প্রকরণ দেখিলে জানা যায়। পাঠকগণের সুখবোধার্থ এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি; দেখিবেন, প্রাচীন সৈনিক পুরু-

যেবা কিরূপে যুদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

" ব্যূহবচনসঙ্কেতান্ বাদ্যভাষা সমীরিতান।
স্বসৈনিকৈর্বিনা কোঽপি ন জানীযাত্তথা বিধান্॥
নিয়োজযেচ্চ মতিমান্ ব্যূহান্ নানাবিধান সদা।
অশ্বানাঞ্চ গজানাঞ্চ পদাতীনাং পৃথক্ পৃথক্॥
উচ্চৈঃ সংশ্রাবযেদ্ব্যূহসঙ্কেতান্ সৈনিকান নৃপঃ।
বামদক্ষিণসংস্থোবা মধ্যস্থো বাথ সংস্থিতঃ॥
শ্রুত্বা তান্ সৈনিকঃ কার্য্যমনুশিষ্টং যথা তথা।
সম্মিলন" প্রসবণং পবিভ্রমণমেবচ॥
আ কুঞ্চনং তথা যানং প্রযানমপযানকম।
পর্য্যাযেন চ সাম্মুখ্যং সমুত্থানঞ্চ লুণ্ঠনম॥
সংস্থানঞ্চাষ্টদলবৎ চক্রবদ্গোলতুল্যকম।
সূচীমুখং শকটবদর্দ্ধচন্দ্র সমন্তবা॥
পৃথক্ভবনমল্পাল্পৈঃ পর্য্যাযৈঃ পংক্তিবেশনম্॥
শস্ত্রাস্ত্রযোর্দ্ধাবণঞ্চ সন্ধানং লক্ষ্যভেদনম্।
মোক্ষণঞ্চ তথাস্ত্রানাং শস্ত্রানাং পবিঘাতনম্।
দ্রাক্ সন্ধানং পুনঃ পাতো প্রহোমোঘঃ পুনঃ পুনঃ।
স্বগূহনং প্রতীঘাতঃ শস্ত্রাস্ত্রপদবিক্রমৈঃ॥
দ্বাভ্যাং ত্রিভিশ্চতুর্ভির্বা পঙ্‌ক্তিতো গমনং ততঃ।
তথা প্রাগ্‌ভবনং চাপসবণং ভূপসর্জনম্॥
অপ্রস্থত্যাস্ত্র সিদ্ধর্থমুৎসৃত্য বিমোক্ষণে।
প্রাগভূত্বা মোচযেদস্ত্রং ব্যূহস্থঃ সৈনিকঃ সদা॥
আসীনঃ স্যাদ্বিমুক্তাস্ত্রঃ প্রাগ্বাচাপ সযেৎপুনঃ।
প্রাগাসীনংভূপ স্থতো দৃষ্টা স্বাস্ত্রং বিমোচযেৎ॥"

ব্যূহরচনার জন্য বাদ্য অথবা ভাষার সঙ্কেত কল্পনা করিবেক। (অমুক প্রকার বাদ্য বাদিত হইলে অমুক ব্যূহ হইবেক অথবা অমুকশব্দ উচ্চারিত হইলে অমুক ব্যূহ রচিত হইবেক ইত্যাদি)। সেই বাদ্যে-তিক বাদ্য অথবা সাঙ্কেতিক ভাষা কেবল স্বীয় সৈন্যেরাই জ্ঞাত থাকিবেক, অন্য কেহ জানিতে না পারে—এরূপ নিয়মে করিবেক।

বুদ্ধিমান রাজা অথবা সেনানায়ক বহুবিধ ব্যূহরচনা করিবেন; (উপযুক্ততা-অনুসারে) অশ্বসৈন্যের, হস্তিসৈন্যের ও পদাতিসৈন্যের পৃথক্ পৃথক্ বা ভিন্ন ভিন্ন ব্যূহ নির্ম্মাণ করিবেন।

রাজা কিংবা রাজপ্রতিনিধি ব্যূহ-সঙ্কেত সকল উচ্চরবে শুনাইবেন। ব্যূহের বামভাগে, অথবা দক্ষিণভাগে, এবং (সময় বিশেষে) মধ্যস্থলে থাকিযা এক্কা উচ্চরবে সাঙ্কেতিক শব্দ করিবেন, যেন ব্যূহস্থ সমস্ত সৈনিকেই শুনিতে পায়।

সৈনিকগণ সেই সেই সাঙ্কেত ধ্বনি বা সাঙ্কেতিক ভাষা শুনিযা শিক্ষাকালে যেরূপ উপদেশ পাইযাছিলেন, ঠিক্ সেইরূপ কার্য্য করিবেন। সম্মীলন, প্রসবণ, পরিভ্রমণ, আকুঞ্চন, যান, প্রযাণ, অপযান, পর্য্যাযক্রমে সাম্মুখ্য, সমুত্থান, লুণ্ঠন, অষ্টদলাকারে অবস্থান, অথবা চক্রাকারে বেষ্টন, সূচীতুল্য, শকটাকার, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, পৃথক্ ভবন, (পঙ্‌ক্তি ছাড়া হওযা), অল্পে অল্পে ও পর্য্যাযক্রমে পঙ্‌ক্তি-প্রবেশ, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে অস্ত্রশস্ত্রাদির ধারণ, সন্ধান, লক্ষ্যভেদ, অস্ত্রক্ষেপ, শস্ত্রনিপাত, শীঘ্র শীঘ্র সন্ধান, শীঘ্র অস্ত্রাদিগ্রহণ, শীঘ্র অস্ত্রনিপাত, শীঘ্র অস্ত্রক্ষেপ, শীঘ্র আত্মরক্ষা অথবা আপনাকে লুক্কায়িত করা, অস্ত্রের দ্বারা, শস্ত্রের দ্বারা, অথবা পাদসঞ্চারণ দ্বারা আত্মরক্ষা ও পরকীয় সৈন্যের বা প্রহরীর প্রতিঘাত করা, দুই দুই জনে, তিন তিন জনে, কিংবা চারি চারি জনে একত্রিত হইয়া পঙ্‌ক্তি-

ক্রমে গমন করা, পিছু হাঁটা, সম্মুখদিকে বা সম্মুখভাবে পলায়ন করা, পশ্চাদ্ভাগে সৈনিকগণ সঙ্কেত অনুসারে পলায়ন করা, অথবা শত্রুর দিকে ধাবিত হওয়া, ইত্যাদি বহুবিধ কার্য্য পূর্ব্বশিক্ষা-অনুসারেই করিবেন, অন্যথাচরণ করিবেন না।

ব্যূহস্থিত সৈনিক অস্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত (অব্যর্থতার নিমিত্ত) উপসরণ অর্থাৎ অগ্রে (সম্মুখে) ধাবিত হইবে, পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ পিছু হাঁটিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিবে।

বিক্ষিপ্তাস্ত্র সৈনিক বসিয়া পড়িবেন, অথবা পিছু হাঁটিয়া আসিবেন। বিপক্ষকে যখন উপবিষ্ট দেখিবেন, তখনই অমনি তৎসমীপবর্ত্তী হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন।

শুক্রনীতি গ্রন্থে এইরূপ আশ্চর্য্য যুদ্ধকার্য্যসকল বর্ণিত হইয়াছে। অবশেষে কার্য্যসঙ্কট অনুসারে ক্রিয়া পরিবর্ত্তন করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল ক্রিয়াকৌশল পর্য্যালোচনা করিলে জ্ঞান হয় যে, ইহা অপেক্ষা গুরুতর ও কঠিন কার্য্য আর নাই। এই কার্য্যে যে কত মনোবল ও কত তৎপরতা লাগে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। পূর্ব্বে যে ক্রৌঞ্চ ও মকর প্রভৃতি ব্যূহের উল্লেখ করা হইয়াছে, শুক্রনীতি গ্রন্থে সে সকলের সঞ্চালন সম্বন্ধে কয়েকটী উপদেশ আছে। যথা—

"একৈকশো দ্বিশোবাপি সঙ্ঘশো বোধিতা যথা
ক্রৌঞ্চানাং যে গতির্যাদৃক্ পঙ্‌ক্তিতঃ সম্প্রজায়তে।
তাদৃক্ সঞ্চারয়েৎ ক্রৌঞ্চ ব্যূহংদেশবনং যথা॥
সূক্ষ্মগ্রীবং মধ্যপুচ্ছং স্থূলপক্ষন্তু পঙ্‌ক্তিতঃ।
বৃহৎ পক্ষং মধ্যগল পুচ্ছং শোনং মুখে নতু॥
চতুষ্পাদমকরো দীর্ঘ স্থূল বক্ত্রোদ্বিরোষ্ঠকঃ।
সূচী সূক্ষ্ম মুখো দীর্ঘ দমদন্তাকারযুক্ত॥
চক্রব্যূহশ্চৈকোমার্গো অষ্টধা কুণ্ডলীকৃতঃ।
চতুর্দ্দিক্ষু পরিধিঃ সর্ব্বতোভদ্র সংজ্ঞক॥
অমার্গশ্চাষ্ট বলয়ো গোলকঃ সর্ব্বতোমুখঃ।
শকটঃ শকটাকারো ব্যালো ব্যালাকৃতিঃ সদা॥
সৈন্যমল্পং বৃহদ্বাপি দৃষ্ট্বামার্গং রণস্থলং।
ব্যূহৈর্ব্যূহেন ব্যূহাভ্যাং সাঙ্গযেণাপি কল্পয়েৎ॥'

রাজা অথবা সেনাপতি যেমন সঙ্কেত প্রকাশ করিবেন, সৈনিকগণ তদনুসারে হয় একে একে, না হয় দুই দুই জনে, কিংবা বহুজনে শিক্ষানুরূপ সঞ্চরণে প্রবৃত্ত হইবেন। বলাকাসমূহ যেমন আকাশে পঙ্‌ক্তিক্রমে গমন বা ভ্রমণ করে, দেশ (যুদ্ধস্থান) ও সৈন্যবল বিবেচনা করিয়া, সেইরূপ সেইরূপক্রমে ক্রৌঞ্চব্যূহ সঞ্চালন করিবেক। (ক্রৌঞ্চ অর্থাৎ বক ; তৎপঙ্‌ক্তি সঞ্চারণের ন্যায় সঞ্চারিত হয় বলিয়া এই ব্যূহের নাম ক্রৌঞ্চ)।

পঙ্‌ক্তিক্রমে গ্রীবাদেশ সূক্ষ্ম, পুচ্ছদেশ মধ্যম, পক্ষদ্বয় স্থূল অর্থাৎ বিস্তৃত করা আবশ্যক। শ্যেনব্যূহের পক্ষ বিস্তৃত, গলদেশ ও পুচ্ছ মধ্যম, মুখ শ্যেনপক্ষীর তুল্য।

মকরব্যূহ চতুষ্পদাকার, বক্ত্রদেশ স্থূল ও দীর্ঘ, ওষ্ঠ দ্বিগুণ। সূচীব্যূহের মুখ সূক্ষ্ম, দীর্ঘ ও দমদন্তাকার, এবং রন্ধ্রযুক্ত।

চক্রব্যূহের মার্গ অর্থাৎ প্রবেশযোগ্য পথ একটী, ৮টী কুণ্ডলাকৃতি পঙ্‌ক্তির দ্বারা বেষ্টিত। সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহের চতুর্দ্দিকে ৮ পরিধি, এতাবন্মাত্র বিশেষ আছে। ইহার প্রবেশযোগ্য দ্বার নাই, বলয়াকৃতি ৮ পঙ্‌ক্তির দ্বারা নির্ম্মিত ও গোল। সকল দিকেই ইহার মুখ থাকে।

শকটব্যূহ শকটাকার, ব্যালব্যূহ সর্পাকার এইরূপ অন্যান্য ব্যূহও অন্যান্য জন্তুর আকারবিশিষ্ট।

সৈন্য অল্প কি অধিক, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, রণভূমি কিরূপ তাহা নির্ণয় করিয়া, সঞ্চরণের পথ কিরূপ দেখিয়া, হয় একটী, না হয় দুইটী অথবা ৩।৪টী ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধ করিবেক এবং রণভূমি, সৈন্য, ভ্রমণ-পথ,—ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া হয় কোন নির্দ্দিষ্টব্যূহ রচনা করিবেক, অথবা সঙ্কর বা মিশ্রিত ব্যূহ নির্ম্মাণ করিবেক।

ব্যূহসম্বন্ধে ইহার অতিরিক্ত কথা মহাভারতের টীকায় সংগৃহীত আছে। বিস্তার ভয়ে সে সকল উল্লেখ করিলাম না। ফল, যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় প্রাচীন যুদ্ধপ্রণালীর এক প্রকার সামান্য ছবি প্রদর্শিত হইল। অতঃপর আমরা ধর্ম্মযুদ্ধ ও কূটযুদ্ধের কতিপয় নিয়ম বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

শ্রীরামদাস সেন।

শব্দ-শক্তি ও বাঙ্গালা ভাষা।

মানব কণ্ঠবিনিঃসৃত শব্দের কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি! এই শব্দবশতঃ প্রথম শূরের অসি নিষ্কোষিত হইয়াছিল; আবার এই শব্দনিবন্ধন সেই রুধিরর‍ঞ্জিত কৃপাণ হত্যাকাণ্ড হইতে বিরত হইয়া থাকিবে। এই শব্দ-প্রয়োগ-চাতুর্য্যে জগতের কত ইষ্ট কত অনিষ্ট ঘটিতেছে, ঘটিয়াছে ও ঘটিবে। কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি মানবশত্রু রিপুকলাপের পরিচয় এই একমাত্র শব্দ সাহায্যে অনুষ্ঠিত হয়। এক পক্ষে যে সুমিষ্ট হৃদয়গ্রাহী শ্রবণমধুর শ্রুতিসুখকর স্নেহনিঃসিন্দী অমৃতস্রাবী বাক্যালাপে প্রিয়জনের মনোরঞ্জন করিয়া থাকি; হৃদয় আর্দ্র করিতে চেষ্টা করি, তৃপ্ত, সন্তুষ্ট, প্রীত, অপ্যায়িত, আনন্দিত, উল্লাসিত করিয়া থাকি ও অপর পক্ষে যে কর্কশ, পরুষ, রূক্ষ, কটু, হৃদয়দগ্ধকর, শ্রবণকঠোর, ঘৃণা-অভ্যসূয়া-সূচক, মর্ম্মচ্ছেদী, মর্ম্মভেদিশক্তিশেলতুল্য-বাক্যপ্রয়োগে চিরশত্রুকে তিরস্কার, ধিক্কার, অবমাননা, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করিতে পারি, মনঃপীড়া দিতে, তর্জ্জন ভাড়না করিতে পারি, তাহা সমস্তই এই এক শব্দের খেলা। এ জগতে শব্দই ইন্দ্রজাল—জাদু। কুৎসিত পুরুষ শব্দ নৈপুণ্যে, শব্দ-প্রযোগ-পারিপাট্যে রম্ভাতিলোত্তমার মন আকর্ষণ করিতেছে। সূর্য্য চন্দ্র তারা কতদূরে অবস্থিতি করিতেছে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই শব্দ সাহায্যেই তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতে চেষ্টা করিতেন। মানবের ব্যাধিমন্দির দেহে রোগসঞ্চার হইলে শব্দরূপ ঔষধ (১) প্রদত্ত হইত। এক কথায় শব্দ অষ্টমূর্ত্তি বিধাতার রূপান্তরমাত্র বলিয়া অতি পূর্ব্বকালে স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

পক্ষান্তরে 'মাতৃভাষা' কি আদরের সামগ্রী! যে ভাষায় শৈশবে অমৃতস্রাবী কাকলিপ্রয়োগে স্নেহময়ী জননীর কত আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছি, যে ভাষায় বাল্যকালে সমবয়স্কদিগের সহিত প্রথম বন্ধুতা স্থাপন করিয়াছি, যে ভাষায় যৌবনে জীব-

(১)। মন্ত্রদ্বারা রোগশান্তি করিবার চেষ্টা বহুকাল হইতে আমাদের দেশে প্রচলিত। যদি শব্দের দ্বারা মানব চন্দ্র, সূর্য্য, দীপ্তি, তরু, লতা, জল, আকাশ—সকলকে, বশীভূত করিতে পারেন, রোগ বশীভূত করিতে কি জন্য পারিবেন?

নের সর্ব্বসুখোৎসর্জ্জনী সহধর্ম্মিণীকে প্রণয়-সম্ভাষণ করিয়াছি, যে ভাষাদ্বারা প্রৌঢ় অবস্থায় জীবনের সমস্ত ত্রিবর্গপ্রয়োজন—ধর্ম্ম অর্থ কাম সকল—সমাধা করিয়াছি ও যে ভাষায় বার্দ্ধক্যে পলিতকেশ, গলিত দন্ত ও সংসারনিস্পৃহ হইয়া নির্জ্জনে একচিত্তে সেই করুণাময় পরমেশ্বরের অপার মহিমা চিন্তা করিতেছি, সে ভাষা কাহার না আদরের সামগ্রী? অপিচ মাতৃভাষাসদৃশ কোমল-মধুরলীনিকণ বিনিন্দিত শ্রুতিসুখকর সঙ্গীত কোথায় শুনিয়াছ? স্বদেশে, স্ববাসভূমে, স্বগৃহে পিতামাতাভ্রাতাভগিনীপুত্রকলত্রাদি পরিজনবেষ্টিত থাকিয়া মাতৃভাষার বাস্তব মাধুর্য্য সম্যক্ উপলব্ধ না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু বিদেশে আসিয়া দেখ, বিদেশীয় ভিন্ন আচার, ব্যবহার ও পরিচ্ছদ দেখিয়া প্রথম প্রথম কত না আনন্দিত হইবে, হয়ত তাহাদের অনুকরণ করিতেও চেষ্টা করিবে; তাহাদের ভাষা শ্রবণ কর, শিক্ষা কর, সেই ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত কর ও স্বজাতীয় কথা একবারে ভুলিয়া যাও, কিন্তু সেই বিদেশে যদি স্বজাতীয় ভাষায় একবার কাহাকেও কথা কহিতে শুনিতে পাও, তাহা হইলে মাতৃভাষার কোমলতা ও মাধুর্য্য বেশ বুঝিতে পারিবে। ফলতঃ মাতৃভাষা সকলের পরম আদরের সামগ্রী; সুতরাং সেই ভাষার উন্নতি ও সংস্কার সকলেরই ইপ্সিত হইবে সন্দেহ নাই। সমস্ত সভ্যজাতির মধ্যে স্ব স্ব মাতৃভাষার বিশেষ আদর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, আমাদের দেশে তবে কিজন্য না পাইবে? আমরা কি সভ্যজাতি মধ্যে গণ্য নহি? আমাদের অনেক শিখিতে বাকী আছে সত্য, কিন্তু আমরা যে সকল সভ্যজাতির শীর্ষস্থানীয় আর্য্যজাতিসম্ভূত, অতএব মাতৃভাষার গুণগরিমা প্রকাশ করিতে কিজন্য বিমুখ হইব?

হিমাদ্রির পূর্ব্বভাগের দক্ষিণ তল হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত ও সাঁওতাল পরগণা হইতে মণিপুর কাছাড় ও ত্রিপুরা অবধি ভারতখণ্ডকে বঙ্গদেশ বলিয়া ভূগোলবেত্তারা স্বীকার করেন (১)। এই সুবিস্তৃত দেশে যে একভাষা প্রচলিত থাকিবে তাহা কখনই সম্ভব নহে। উত্তর আসাম, ভুটানওয়াই ও কোচবেহারের ভাষা শুনিলে বাঙ্গালা বলিয়া বোধ হয় না। এমন কি, পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ যদিও বাঙ্গালাভাষায় কথা কহিয়া থাকেন, ও অনেক পরিশুদ্ধ সংস্কৃতশব্দও প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তথাচ তাঁহাদের মধ্যে শব্দপভ্রংশ এতাদৃশ শোচনীয় আধিক্যে পরিণত হইয়াছে যে, তাঁহারা যে বাঙ্গালা কথা কহিতেছেন, তাহা সহজে অনুমান করা যায় না। পূর্ব্বাঞ্চলবাসিগণের উচ্চারণপ্রণালীও ভিন্নপ্রকার, সেই জন্যই, বোধ হয়, তাঁহাদের কথা সহজ বোধগম্য হয় না। আবার ব্রহ্মদেশের সমীপবর্ত্তী গৌড়াংশের বাঙ্গালা, চব্বিশপরগণা হুগলী কৃষ্ণনগর ও বর্দ্ধমানের বাঙ্গালা হইতে অনেক বিভিন্ন। বঙ্গ ও মগধের সীমা স্পষ্টরূপে চিহ্নিত নাই। কোথায় যে বঙ্গভাষা হিন্দীভাষায় মিলিত হইয়াছে, তাহা নির্দ্ধারিত করা সুকঠিন (২)। মিথিলাবাসিগণ ঠিক হিন্দীভাষায় কথা কহে না, তাহাদের হিন্দী ও তুলসীদাসের

(১) কেহ কেহ আসামকে বঙ্গদেশভুক্ত করিতে ঘোর আপত্তি করিয়া থাকেন।

(২) কেহ কেহ বলেন যে, ভাগলপুর জেলার স্থানবিশেষে এই সীমা কথঞ্চিৎ নির্ণীত হয়। বৈদ্যনাথ, শিমুলতলা, ও ধর্ম্মাটার না বাঙ্গালা না বেহারের অন্তর্গত।

হিন্দী অনেক ভিন্ন। বোধ হয় এক সময়ে অনতিকাল পূর্ব্বে সমস্ত বঙ্গ ও বেহারের একই ভাষা ছিল (১)। মুসলমানগণ উত্তরপশ্চিম-প্রদেশস্থ হিন্দীভাষায় বিলক্ষণ অভিজ্ঞ ছিল। তাহারা মিথিলায় আসিয়া প্রথমে হিন্দী হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র ভাষা শুনিতে পায়; সেই জন্য বোধ হয় দ্বারভাঙ্গা (দ্বারবঙ্গ) নামে মিথিলাস্থিত একটী স্থানকে নির্ণয় করিয়া থাকে। অপিচ মিথিলা যে বঙ্গের দ্বার, তাহাতে বড় সন্দেহও করা যায় না। উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশস্থ ব্রাহ্মণেরা মৎস্য-মাংস বিদ্বেষী। মৈথিলী ব্রাহ্মণের মৎস্য-মাংসে তাদৃশ বিদ্বেষী নহে। অনেক কথা যাহা আমরা প্রত্যহই ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার উৎপত্তি ও মূল সংস্কৃতভাষায় দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু মিথিলায় তাহাদের উৎপত্তি ও হেতু অনায়াসে অনুমিত হয়। "খাইলেন," "গেলেন," "আসিলেন," "নাহিক," "নাইকো" প্রভৃতি শব্দের শেষাংশ "লেন" ও "ইক" প্রত্যয় কোথা হইতে আসিল? বাঙ্কুড়া জিলায় প্রায় সকল কথার শেষে এই "ইক" প্রত্যয় বসিয়া থাকে; যথা—"করিবেক," "খাইবেক," "কতেক," ইত্যাদি; ও অসমাপিকা ক্রিয়াতে "ক" ধাতুর অসংলগ্ন প্রয়োগ ভূরি ভূরি লক্ষিত হয়। এ সমস্তের মূল আধুনিক বেহার-ভাষা। "আইলন," "খাইলন," "গইলন" বেহারে কৃষকের মুখে সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়। "আইবেনা করব" সমাপিকা ক্রিয়া হইয়া গেল। "আইবেনা" কর্ম্মকারক সম্বন্ধে ক্রিয়া "করব" সহিত বদ্ধ। বাঙ্কুড়ানিবাসিদিগের "আনাকরা," "খাওয়া করা" ও চব্বিশ পরগণার "খাওয়া দাওয়া করিয়া যাইব" কিম্বা "গমন করিব"র হেতু মিথিলা ভাষায় লক্ষিত হইবে। আমাদের আজকাল যে বঙ্গভাষায় পুস্তকাদি লিখিত হইতেছে, তাহা প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশ নহে। সংস্কৃতের (২) সহিত প্রাকৃত-ভাষা চিরকাল প্রচলিত ছিল। সেই প্রাকৃত ভাষায় বুদ্ধশিষ্যেরা তাঁহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থসকল লিখিয়া 'পণ্ডিতী'ভাষা করিয়া তুলেন। প্রাকৃত যেমন পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক আদৃত হইয়া উঠিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার অপভ্রংশও অপরিহার্য্য হইয়া পড়িল। কারণ মূর্খ ও পণ্ডিত স্ত্রী ও পুরুষের ভাষা একরূপ সংস্কৃত হইবার কখন সম্ভাবনা নাই। সেই মগধী অথবা পালীর অপভ্রংশ মৈথিলী-ভাষা হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ নাই বলিলেও বলা যাইতে পারে। কারক ও লিঙ্গভেদে সংখ্যাবাচক দুই একটী প্রত্যয়ের আবশ্যকতা হয়। ক্রিয়ার কালনির্ণয়ার্থে ও পুরুষনির্ণয়ার্থে যাহা কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তাহা এত সামান্য যে তজ্জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন হয় না। এক "অস" ও "ভূ" ধাতু সংযোগে বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ কাল নির্ণয় হইয়া থাকে। তিনি করেন, করিতেছেন, করিয়াছেন

(১)। ত্রিহুতের বর্ণমালা অবিকল বাঙ্গালা বর্ণমালার সদৃশ। যে দুই একটী বর্ণের স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয় তাহা অতি সামান্য। বিদ্যাপতি ত্রিহুতীয় ব্রাহ্মণ, তাঁহার গ্রন্থে স্থানে স্থানে অবিকল বাঙ্গলাশব্দ-বিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ সহজেই অনুমেয়।

(২)। সংস্কৃত যে কোনকালে চলিত ভাষা ছিল, তাহা ঘোর সন্দেহের স্থল। সংস্কৃতনাটকে উচ্চতম নায়ক মাত্রের সংস্কৃত ভাষায় এবং নায়িকা ও অপরাপর নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিমাত্রের অসাধু সংস্কৃত অর্থাৎ প্রাকৃতে কথা কহিবার যে প্রথা দৃষ্ট হয়, তাহা বোধ হয় আলঙ্কারিকদিগের সৃষ্টি।

ও করিবেন। অনুজ্ঞা "কর," এবং "ছেন," "আছেন" ও "বেন" এই তিনটীমাত্র প্রত্যয় মনে করিয়া রাখিলে ধাতুরূপ আদর্শ শেষ হইয়া গেল; কিন্তু বাক্যবিন্যাস-বিষয়ে বাঙ্গালাভাষা ঠিক সংস্কতের অনুকরণ করিয়া থাকে। প্রথমে বিশেষণ, তাহার পর বিশেষ্য কর্ত্তৃপদ, তবে প্রাতিপদিক। ফলকথা, বঙ্গভাষায় ব্যাকরণের বড় আবশ্যকতা নাই। আর যে টুকু ব্যাকরণের প্রয়োজন, তাহা সম্যক সংস্কতের অনুরূপ নহে। সন্ধি-সংযোগ ও সমাস, এবং ণত্ব ও সত্ববিধান ছাড়িয়া দিলে বঙ্গভাষার সংস্কতের সহিত কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই। কিন্তু এক বিষয়ে বঙ্গভাষা, ভাষাপ্রসবিনী সংস্কতমাতার প্রধানা কন্যা বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষায় যত কথা আছে, প্রায় ১৬ অংশের ১৫ অংশ সংস্কত। উড়িয়া ও মহারাষ্ট্র ভাষা, ব্যাকরণসম্বন্ধে, সংস্কতের অধিকতর নিকটবর্ত্তিনী; কিন্তু শব্দসম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষা সংস্কতের যত নিকট এত অন্য কোন ভাষা নহে। গীতগোবিন্দ পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, কেবল বিভক্তিগুলি তুলিয়া লইলে সংস্কত বাঙ্গালা হইয়া যায়। কিন্তু বাচনিক ভাষায় অর্থাৎ যে ভাষায় আমরা সচরাচর বাক্যালাপ করিয়া থাকি, তাহাতে অনেক অসংস্কত কথা প্রয়োগ করিয়া থাকি। আমরা দৈনিক প্রয়োজনসাধনার্থে অন্যূন তিন শত কি চারিশত কথা কহিয়া থাকি, তন্মধ্যে বোধ হয় অর্দ্ধের কের কিছু ন্যূন অপর জাতীয় বাক্য ব্যবহার করি। ইংরাজির কথা বলিতেছি না, যাঁহারা আমাদের দেশে ইংরাজী জানেন না, তাঁহারাও অনেক বিজাতীয় শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সমস্ত বিজাতীয় শব্দের উৎপত্তি-নির্ণয় ও 'শক্তি' পর্য্যালোচনা করাই এই প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য।

আমাদের স্নেহ ও ভক্তিভাজন সমস্ত জ্ঞাতি বন্ধুর নাম সংস্কত হইতে পাইয়াছি, যথা—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী (বহিন, বোন), দাদা, তাত, দিদি, পিসি, মামী, জামাই, পুত্র, স্ত্রী, বৌ (বধূ), জ্যেঠা, খুড়া, মামা। বাপ সংস্কত 'বপ' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিলেও বলা যাইতে পারে, কিন্তু "বাবা" শব্দ ফারসী। "ছেলে," "ছোকরা"—কোথা হইতে আসিল?

অলসতা, মূর্খতা ও সময়-সাশ্রয় চেষ্টা যাবতীয় বাক্যবিশ্লেষ ও অপভ্রংশের প্রধানতম কারণ বলিয়া ভাষাবিশারদেরা স্থির করিয়াছেন। এককালে মনুষ্যসন্তানও যে 'শাবক' শব্দে উল্লিখিত হইত, তাহার সাক্ষ্য "ছেলে, ছোকরা" ইতর ভাষায় "ছোঁড়া, ছুঁড়ি" জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। শাবক হইতে ছাবক। অন্তঃস্থ 'ব' "ওয়া"-ন্যায় উচ্চারিত হয়, সেই জন্য "ছাবক" "ছাওয়ক" ও তৎপরে 'ক'স্থানে সুমিষ্ট 'ল' হইয়া গিয়াছে। অবশেষে "ছেলে-ছোকরা"। 'ব'স্থলে 'ল' ও 'ল'স্থলে 'ব' প্রায় শব্দান্তরিত হইয়া থাকে। "কাকা" শব্দ—না বাঙ্গালা, না হিন্দী, না সংস্কত। উহা ফারসী "কোকার" অপভ্রংশ। "কোকা" শব্দে ফারসী-ভাষায় পালনকর্ত্তা। প্রায় পিতৃকনিষ্ঠেরা ভ্রাতষ্পুত্রের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ দেখাইয়া থাকেন, সেইজন্য বোধ হয় "কোকা" শব্দে খুল্লতাত বুঝাইয়া থাকে (১)।

(১)। চাচা হিন্দী=বাঙ্গালা কাকা (C. F. church (English)=Keik (Scotch.)

তৎপরে এস পাঠক, আমাদের পর্ণকুটীর হউক বা বৃহৎ হর্ম্ম্যই হউক, গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করি। হিন্দু-অন্তঃপুর চির-পবিত্র, অসূর্য্যম্পশ্য; আমাদের স্ত্রীদিগের একটী আদরের ও গৌরবের নাম সেখানে দেখি। আত্মীয়স্বজনেরা হাসিতেছেন; শিশুসন্তানেরা খেলা করিতেছে, মারামারি করিতেছে, কাঁদিতেছে, দৌড়িয়া বেড়াইতেছে, স্নেহময়ী জননী কোন বালককে ক্রোধশান্তির জন্য কোলে লইয়া "আয় আয় চাঁদ আয়" বলিয়া আকাশের দিকে বালকের মুখ তুলিতেছেন, ও অঞ্চলের দ্বারা নেত্রজল মুছাইতেছেন, কাহাকেও বা তর্জ্জন করিতেছেন, দাসীকে নানা কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছেন, গোরুর সেবার জন্য আপনি বড় ব্যস্ত, অথবা আমাদের সেই প্রাচীনা আর্য্য জাতি প্রধান যন্ত্র (জাঁতা) লইয়া আপনি কলাই ভাঙ্গিতেছেন। দেখিলে বোধ হইবে, এখানে—এ পবিত্র স্থানে বিজাতির কখনও আগমন হয় নাই। কিন্তু একটু অপেক্ষা কর, দেখিবে এখানে যদিও আমিরা আমাদের বৈদিক পূর্ব্ব-পুরুষদিগের মত হাসিতেছি, কাঁদিতেছি, যন্ত্রপেষণে আহার্য্য প্রস্তুত করিতেছি, ছেলেপিলের বিয়ে-পৈতা অন্নপ্রাশন ঠিক্ পূর্ব্বপুরুষদিগের মত অনুষ্ঠান করিতেছি,—দেখ এখানেও, এই অন্তঃপুরমধ্যেও, বিজাতীয় শব্দের অভাব নাই। তোমার স্ত্রী ঐ যে মলিনবসনা, কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রীলোকটীকে ডাকিলেন, কই? সখি সম্বোধন ত করিলেন না! উহাকে "চাকরাণী" বলিয়া ডাকিলেন। "ঝি, দেয়ালের ধূলা ঝাড়িয়া দে," "ঝরকা থেকে চিক্ সরাইয়া রাখ," "রোয়াকে কেবল বসিয়া থাকিবি?" "মনিবের কথা কাণে করিস্ না?" "দালানের দোর বন্ধকর," "কুলুপ উপর হইতে লইয়া আয়," "চাবী দে," "মাহিয়ানার জন্য কেবল তাগাদা" ? "বোস্, আগে মাসকাবার আসুগ্!"(২) কি সর্ব্বনাশ! এই চল্লিশটী কথার মধ্যে একটী কথা যে একবারে বুঝিলাম না! সংস্কৃত-অভিধানে "চাকরাণী, দেয়াল, ঝরকা, চিক, রোয়াক, মনিব, দালান, কুলুপ, চাবী, তাগাদা, মাসকাবার"—এই সকল কথা খুঁজিয়া পাই না। পারশী-অভিধানে দেখি। মুসলমানেরা আমাদের রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিল, আমাদের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিল; আমাদের অনেক ভাল ভাল মন্দির, দেবালয়, তীর্থস্থান ভূমিসাৎ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের শাস্ত্র, তাহাদের ভাষা,—আমাদের অনতিদূরস্থ পূর্ব্বপুরুষ, আমরা এখন যেরূপ যত্নসহকারে ইংরাজী পড়ি, সেইরূপ যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিতেন! এসব কথাগুলি কি তবে মুসলমানদত্ত? হাঁ। পারশী ও আরবী অভিধান খুলিয়া দেখি, "চাকরাণী, মনিব, দেয়াল, তাগাদা (তাকিদ), কুলুপ (কুফল আরবী), ঝরকা"—এসব মুসলমানদিগের নিকট শিখিয়াছি। "রোয়াক, চিক" আরব ও পারস্যবাসী মুসলমানদিগের নয়। তাহারা আরব তুর্কীদিগের নিকট পাইয়াছে। "জানালা, চাবী ও মাসকাবার" কোথা হইতে আসিল? কে বলিবে "বোম্বেটে" (Bombardier) সমুদ্রতস্কর পোর্ত্তুগীজেরা কখন মানবজাতির কোন উপকার করিয়াছিল? তাহারা সত্য সত্যই আমাদিগকে গুটিকতক কথা দিয়া

(২) আমাদের গৃহাভ্যন্তরে অনেক বৈদেশিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফলকথা, বাঙ্গালা মানে ঠিক যে, সংস্কতের অপভ্রংশ নহে, ইহাই এস্থলে সপ্রমাণ।

গিয়াছে। আমরা "জানালা (Yanella), চাবী (chave), মাসকাবার(mesaccabor)"—তাহাদের নিকট পাইয়াছি। পোর্ত্তুগীজেরা আমাদিগকে আরও দুই চারিটী কথা দিয়া গিয়াছে; আমাদের রাজপুরুষদিগের নাম "ইংরেজ"(Englez)পোর্ত্তুগীজ শব্দ। "গির্জ্জা" (Igirja) L. ex stock. "নীলাম, কামরা, আলমারী, কেদারা, কবি ও পাদরী" এই কয়েকটী কথার জন্যও আমরা পোর্ত্তুগীজদিগের নিকট ঋণী।

ভাল কথা মনে পড়িল, তোমার সহধর্ম্মিনী আবার কি বলিতেছেন, শুন. এবার তোমাকেই সম্বোধন করি বলিতেছেন,"তুমি অন্য রকমে কত খরচ কর, একখানা তক্তাপোষ, একটা সিন্দুক আর তৈয়ার হল না? আমি আর পারি নি, হার মেনেছি! কিন্তু শীতকাল এল; না বালিশ,না লেপ গায়ের কিছুই নাই, আপনি তাকিয়া ঠেশান দিয়ে বালাপোষ গায়ে দিয়ে মজা করে বসে থাক, ছেলেরা যে শীতে খুন হয়ে গেল!" হয় ত তুমি উত্তর দিতেছ,—"আমি সব বাসনা দিয়াছি। এবার বড় খাঁকতির মহল, তাই এত দিন হয় নি। জান ত, একজনের জামিন হয়ে আমি এত হাবাগপেরেশান হয়েছি। নইলে তোমার হুকুম কি তামিল হ'তে এত দিন বাকী থাকে? নাও নাও,ঠাণ্ডা হও, এই নাও, তোমার বাজু তাবিজ জসম গাঁথিয়া এনেছি; এই নাও তোমার ছেলের জামা, ব্যাজাই, ছোট মেয়ের পোষাক,—কেমন? খুসী হয়েছ ত?" হয় ত তোমার স্ত্রী বলিবেন (পাঠক, রাগ করো না, মনে কর, আমার স্ত্রীই নয় আমাকে বলিতেছেন)—"যাও, তামাসা, খোসামুদী রাখ; আমার পাঁইজোর কি হ'ল? সুরেনের মোজা আননি?" "কি বিপদ। সব ফরমাস্ কখন একবারে খতিয়ে হয়ে উঠে? বাজারে গেলেই তুলচুক্ হয়ে থাকে"। এই যে স্ত্রীপুরুষের এতগুলি কথা হইল, ইহার মধ্যে কত কথা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জানিতেন না, অথচ আমরা তাহা জানি। "সিন্দুক, লেপ, তাকিয়া, জামীন, তামিল, হুকুম, তাবিজ, মহল" এ গুলি সব আরবী। "তক্তাপোষ, বালাপোষ, বালিশ, চাদর, ব্যাজাই, খুন, খাঁকতী (কমতি), বাজু, জসম, জামা, পোষাক, মোজা, খুসী, খোসামুদী, পাঁইজোর (পায়াজের)" ইত্যাদি সব পারসী কথা। কতশত কথা আমরা পারসী ও আরবী হইতে পাইয়াছি; কিন্তু কোথা হইতে পাইয়াছি, কয়জন বিদিত আছেন? "কাগজ কলম" আমাদের জিনিস নহে, "জিনিস"-শব্দও আরব হইতে অভ্যাগত। "জাহাজ, তুফান"—আরবী, কিন্তু"মাস্তুল"—ইংরাজী। "কেতাব কানুন"—আরবী,"আইন"—পারসী। "গৃহ, ভবন, আবাস, ভিটা (ভিত্তি), কোট্টা (কোষ্ঠা)"—সংস্কৃত, "মোকাম, জিলা, মেরামত"—আ , "আস্তাবল"—ইংরাজী ও আরবী। "তৈজস, ঘট, ঘটী, বাটুলা, বাটী, ছুঁচ, ছুরী, কাঁচি, শীল, লোড়া, জাঁতা, প্রদীপ, জাঁতী, কড়া (কর্পট)"—সংস্কৃত।"আসবাব,রেকাবি"—আরবী,"চসমা"—পারসী; "সেজ"(shade)—ইংরাজী। "বাজার, দোকান, কর্জ্জ, নগদ, আধ" সওদা, যাবনিক। পশ্বাদির নাম মুসলমানদিগের নিকট শিখিবার আমাদের প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং ভারতবর্ষে পশ্বাদির নাম প্রায় সংস্কৃত। "তোরঙ্গ" (English-Trunk); আর শত শত কথা আমরা বিজাতীয়দিগের নিকট শিখিয়াছি। অনেকে মনে করেন, এই সকল

বিজাতীয় বাক্যের ব্যবহার করা নিষ্প্রয়োজন। অনেক দেশহিতৈষী বিজাতীয় বাক্য-সকলকে অভিধান হইতে দূর করিবার কথাও কহিয়া থাকেন। "আমাদের দেবভাষা সংস্কৃতভাষার শব্দের সহিত বিজাতীয় শব্দ-সকল কখনও শোভা পায় না, বরং তাহাদের অস্তিত্ববশতঃ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের কাপুরুষতা, অপমান ও লজ্জার কথা স্মৃতি-পথে আরূঢ় হয়।" এরূপ মনে করা নিতান্ত অন্যায়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অপেক্ষা আমরা কিছু বীরপুরুষ নহি। অপিচ ভাষার বাক্যকোষ যত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, ততই আহ্লাদের বিষয়। ইংরেজী ভাষা কি? কোন্ ভাষার শব্দ ইংরেজীতে নাই? আর এমন কি মনোভাব আছে,—যাহা ইংরেজী ভাষায় ব্যক্ত না করা যায়? মনে কর, আমরা যাহা মুসলমানদিগের নিকট শিখিয়াছি, তাহা ভুলিয়া যাই কিন্তু তৎ-পরিবর্ত্তে কি ব্যবহার করিব? ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা "ময়দা" খাইতে আপত্তি করেন না। "ময়দা" বলিতে কি আপত্তি করিবার কারণ আছে? "গোধূম চূর্ণ" ময়দার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতে গেলে কত যুগ যুগান্তরে "গোধূম-চূর্ণ" গ্রাম্য ভাষায় মিলিত হইবে বলা যায় না। আমরা যে মুসলমানদিগের নিকট হইতে অনেক ভাল কথা শিখিয়াছি, তজ্জন্য দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। অধিকন্তু যাহা পাইয়াছি, তাহা ছাড়িয়া দিব কিজন্য? শীতকালে যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের কান্থা না লইয়া সুন্দর লেপ (আবরী লেহাপ) আবৃত হইয়া আরামে (পারসী) ঘুমাইতে থাকি, গ্রীষ্মকালে হাওয়া খাইবার জন্য ঝরকা খুলিয়া দিয়া তক্তাপোষ উপরে জাজিম বিছাইয়া তাকিয়া কিম্বা বালিশ মস্তকে রাখিতে পাই, অথবা মিছরির সরবৎ কিম্বা বরফ খাইতে পাই, তজ্জন্য আমাদের মুসলমানদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত (১)। মুসলমানদিগের আধিপত্য শেষ হইয়া গিয়াছে। যে হিন্দুদি-গের প্রতি তাহারা অনেক অত্যাচার করিয়া-ছিল, সেই হিন্দুরা যে কাঠার ধার সেই কাঠায় তাহা পরিশোধ করিয়াছিল। তাহাদের কোরাণ দীপ্তিহীন; মসজিদ হীন-প্রভ, মোল্লা স্তোকভাষী, মধুরভাষী; ফকীর বঞ্চক বলিয়া প্রতিপন্ন; দিল্লীশ্বর বৃদ্ধ, অন্ধ, নির্ব্বাসিত, তৈমুরকুল বিলুপ্ত; তবে আর রাগের কারণ কি? তাহারা আমা-দের অনেক অপকার করিয়াছে সত্য, উপকারও করিয়াছে; আমরা অপকার বিস্মৃত হইয়া উপকারই স্মরণ রাখিব।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়।

---

(১) আমরা অস্বীকার করি না যে, উপরে লিখিত যাবনিক শব্দসকলের অনুরূপ শব্দ সংস্কৃতে পাওয়া যায়। কিন্তু মৃত শব্দ পুনর্জ্জীবিত করিতে চেষ্টা করা অপেক্ষা জীবিত শব্দ প্রয়োগ করা সহজ ও অধিক-তর ফলপ্রদ।

সাধের মরণ।

স্থান—ভাগীরথীতীর, সময়—শুক্লময়ীরজনী।

মরি কি মধুর বিমল যামিনী! তটিনী মাখিছে জোছনা তায়।
সুনীল সলিলে রজত-হিল্লোল অনিল-আঘাতে ছুটিয়া যায়।
ছুটিতে, ছুটিতে—নাচিতে, নাচিতে—কভু এ পড়িছে উহার গায়,
যেন তাড়াতাড়ি কার আগে কেবা তটের চরণ ছুঁইতে পায়।
যামিনী অধরে সুধার হাসিটি যেন রে জগতে দেখাতে চায়।
ভাগীরথী-তীরে কি শোভা ধরেছে কে দেখিবি তোরা আয়রে আয়!
কি শোভা করেছে, কি মায়া করেছে, সুধা যেন ওই তটিনী গায়।
তাই বুঝি আজ পরাণ আমার ও রজত জলে মিশিতে চায়।
তাই বুঝি আজ প্রাণের ব্যথাটি তটিনীর কাণে বলিতে চায়!
তাই যামিনীর গলাটি ধরিয়া হৃদয় ভরিয়া কাঁদিতে চায়!
পরাণ বুঝি বা তাই আজি মোরে থেকে থেকে সাধিছে হায়?
বুঝাইলে কভু না বুঝে বারণ মরি মরি মরি একি রে দায়!
কেঁদে কেঁদে কেঁদে কভু বলে, আমি চাঁদের সুধাটি করিব পান,
কভু বলে, আমি বসি চাঁদ পাশে গাহিব যতেক দুখের গান!
গাহিব গান, ছাড়িব তান, যাহাতে সে চাঁদ শুনিতে পায়;
যাহাতে সে চাঁদ সে গান শুনিয়ে মোর প্রাণ সনে মিশায়ে যায়।
শিশুর হৃদয়ে বাসনা নূতন কত আশা আজি জাগিছে মনে,—
হেন সাধ হয়, এ বিমল বেতে কাঁদি আমি বসি পরাণ সনে;
বিগত যাতনা ডাকিয়া আনিয়া হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখিগো তায়!
বিগত স্বপন ভাবিতে ভাবিতে এ প্রাণ এ বেতে মরিতে চায়!
বিগত বাসনা স্মরিতে স্মরিতে হায় আজি প্রাণ হায়রে হায়!
মরিবার আগে নরনারী যত সবারেই ভাল বাসিতে চায়!
তাই বলি আজ ভাগীরথী-তীরে কে দেখিবি তোরা আয়রে আয়!
পরাণ আমার এ মধুর বেতে রজনীর কোলে মরিতে চায়!
মরণের তীরে দাঁড়ায়ে পরাণ, হৃদয় ভরিয়া দেখিবে আজ,—
জগত-সুষমা, নরনারী যত, প্রকৃতি-বিভব, স্বভাব-সাজ;
মানস-নয়নে দেখিবে জগত, খুঁজিবে মানব-হৃদয়-গুলি;
যার তরে আজ মেতেছে এ প্রাণ, খুঁজিবে তাহার হৃদয় খুলি;

খুঁজিবে তাহার হৃদয়ে পশিয়া, দেখিবে বুঝিয়া
তাহার প্রাণ,
মরণের আগে বিমল সোহাগে শুনাবে তাহারে
একটি গান।
চাঁদের কিরণ মুছিয়ে লইয়ে আদরে মাখাবে
বদনে তার,
তারার মালিকা গাঁথিয়া যতনে পরাবে গলাতে
তারার হার,
চাঁদের হাসিটি কাড়িয়ে লইয়ে রাখিবে যতনে
অধরে তার,
হৃদয় হইতে পরাণ ছিঁড়িয়া রাখিবে রে তার
হৃদয়ে আজ;
তার প্রাণ চুরি করিয়া লুকায়ে রাখিবে রে
মোর হৃদয়-মাঝ!
তাই বলি, ছোটশিশুটি মতন, কত আশা মনে
জাগিছে আজ!
বিমল যামিনী, বিমল তটিনী, তাই দেখে
আজ মেতেছে প্রাণ,
বিমল শশীর বিমল কিরণ, তাই মনে এত
আশার গান!
সকলি বিমল,—বিমল পরাণে,-বিমল বাসনা
জেগেছে তায়!
তাই আজি প্রাণ এ বিমল বেতে রজনীর
কোলে মরিতে চায়!
কেমন মরণ, কেমন বাসনা, কে দেখিবি
তোরা আয়রে আয়।
তার প্রাণ-আশে আগে মোর প্রাণ তাহার
চরণে বিকায়ে যায়!
যদি বা পরাণ যাইল বিকায়ে, মরির কি লয়ে
ভাবিছি তাই;
যদি এ পরাণ হইল পরের; মরিতে কিসে তা
ফিরায়ে চাই!
সকলি হইল, পরাণ(ও) যাইল; কই তবু
তাতে মরণ নাই!
ভাবিছি বসিয়া, এ বিমল বেতে কিসে সে
মরণ দেখাটি পাই!
তাই বলি আয়, আয়রে জগত, আয়রে আয়রে
আয়রে আয়!
বিমল নিশায় বিমল প্রাণের সাধের মরণ
দেখরি হায়!!

শ্রীপ্রাণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। **চিকিৎসা-সম্মিলনী**। (চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা)। ডাক্তার শ্রীঅন্নদাচরণ খাস্তগির ও কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা।

আমরা ইহার প্রথম সংখ্যামাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকার আবরণ-পত্র-পাঠে জানা যায় যে, ইহা মাসিক পত্রিকা; কিন্তু আমাদিগের প্রাপ্তসংখ্যাখানি কোন্ মাসের, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। পত্রিকার ছাপা ও কাগজ ভাল, উদ্দেশ্যও মহৎ।

দুর্ভাগ্য বঙ্গভূমে সকল বিষয়েই মতভেদ, সকল বিষয়েই পরস্পর মনের মালিন্য। চিকিৎসা সম্বন্ধেও তাহা কিছুমাত্র অক্ষুণ্ণ নহে। আমাদিগের প্রাচীন বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত চিকিৎসাপদ্ধতি মধ্যে নিতান্ত বিরল হইয়া পড়িয়াছিল; সম্প্রতি তাহার উন্নতির পথে মৃদু

পাদবিক্ষেপ বড়ই আনন্দকর। কিন্তু কবিরাজ-মহাশয়দিগের শৈথিল্যে, বনজ ওষধির অপ্রাচুর্য্যে এবং ধাতুজ ও তৈলজ ঔষধ সকলের মূল্যাধিক্যে সকল সময়ে বিশুদ্ধ কার্য্যকারক 'বাঙ্গালা' ঔষধ পাওয়া যায় না, সুতরাং চিকিৎসারও বিশেষ ফল ফলে না। অপর পক্ষে, আজিকালি ইংরাজি য্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার গুণে অনেক উৎকট রোগ আশু প্রশমিত হয়; সময়ে সময়ে 'হোমিওপ্যাথিক' চিকিৎসারও কার্য্যকারিতা বিশেষ লক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপ নানা কারণে, আমাদিগের দেশে চিকিৎসাবিষয়ে নানারূপ মতভেদ আছে এবং তন্নিবন্ধন গৃহস্থকেও সময়ে সময়ে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। এরূপ অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসাপ্রণালীর সামঞ্জস্যসাধন ও রোগের ভাবভঙ্গানুসারে ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসার কার্য্যকারিতা বিচার করা নিতান্ত আবশ্যক। 'চিকিৎসা সম্মিলনী' এই মহদ্ধিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়া আপামর সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছেন। 'চিকিৎসা-সম্মিলনীর' লেখকগণ সকলেই চিকিৎসাশাস্ত্রে ও ব্যবসায়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোক; তাঁহাদিগের দ্বারা যে এই গুরুতর কার্য্য বিশেষ দক্ষতার সহিত ও নিরপেক্ষভাবে সংসাধিত হইবে, আমরা এরূপ সম্পূর্ণ আশা করিতে পারি। এবারকার লিখিত সমস্ত প্রবন্ধই অসম্পূর্ণ, সুতরাং তৎসম্বন্ধে মতামত আমরা এবারে প্রকাশ করিলাম না, বাস্তবিক বহুলভাবে সমালোচনের ইচ্ছা রহিল। তবে প্রবন্ধগুলির অবতারণা যে পত্রিকার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার্য্য। আমরা নবীনা সহযোগিনীর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি; বঙ্গীয় বিজ্ঞানসংসারে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন ইহাও আমাদিগের ঐকান্তিকী ইচ্ছা।

টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত রায় সতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ইহার পরিচালনজন্য অর্থানুকূল্য করিতে অগ্রসর হইয়া বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। আমাদিগের দেশের প্রত্যেক জমিদার যখন এইরূপ সাধারণ হিতকর ব্রতে অর্থ ব্যয় করিবেন, তখন বুঝিব যে, দেশের প্রকৃত উন্নতি হইতেছে।

উপসংহারে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। পত্রিকার কলেবর অনুসারে উহার মূল্য কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে। মূল্য অধিক দিয়া বাঙ্গালা পুস্তক বা সাময়িকপত্র পাঠ করেন, বঙ্গবাসীর মধ্যে এরূপ পাঠকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। এরূপ অবস্থায় 'চিকিৎসা-সম্মিলনী'কে সকলের অনায়াসলভ্য করিতে হইলে উহার মূল্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ছাত্রদিগের-জন্য-অবধারিত মূল্যই সাধারণের পক্ষে স্থির করিলে ভাল হয়। 'চিকিৎসা সম্মিলনীর' পরিচালন-কার্য্য নিতান্ত ব্যয়-সাপেক্ষ বটে; কিন্তু সাধারণ পাঠক তাহা বড় বুঝিবেন না।

২। কবিতাবলী, প্রথম ভাগ।

শ্রীবামনারায়ণ অগস্তি প্রণীত। কলিকাতা। এই পুস্তকে বিবিধবিষয়ক ২০টী পদ্য আছে; তন্মধ্যে অনেকগুলি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবর্ত্তিত ছন্দের অনুকরণে লেখা। অনুকরণ নিতান্ত মন্দ হয় নাই। তবে ভাবানুভূতির তাদৃশ তীক্ষ্ণতা না থাকায় বর্ণনা কবিতাংশে নিকৃষ্ট হইয়াছে। ভাষা আরও সরল হইলে

ভাল হইত। আমাদের বিবেচনায় ভাষা সর্ব্বত্র সরল না হওয়াতেই বর্ণনার সজীবতা অনেক স্থলে নষ্ট হইয়াছে। সমস্ত কবিতাগুলিতেই 'মামুলি'ভাব, কোনটীতে বিশেষ অভিনবত্ব দৃষ্ট হইল না। উপযুক্ত শব্দব্যবহার এবং শব্দের উপযুক্ত ব্যবহার সম্বন্ধেও লেখক বিশেষ ভাগ্যবান্ নহেন। 'অক্ষীনো' স্থলে 'নিমন্ধ' শব্দের প্রয়োগ ভ্রম। পদোও কবি না। পুস্তকখানি জাবিসন সাহেবকে উৎসর্গ করা হইয়াছে এবং তদুপলক্ষে গ্রন্থকার উক্ত সাহেবকে 'সাধন' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। শব্দটী কিরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে জানি না। সিভিলিয়ান অর্থে 'সাধন' বলিলে ব্যঙ্গ করা হয়, কিন্তু বিসয়ের লেখক ওরূপ তাহাতে 'ব্যঙ্গ' অবশ্যই অসম্ভব।

সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ।

[এই পত্রের "নূতন সভা স্থাপন" এবং "সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ" ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত হয়, অতএব বিষয় বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা।]

১। আমাদের বরাবরই ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে, বুকদাসপ্রমুখ বিটিশ ইণ্ডিয়ান্ আসোসিয়েশন অপেক্ষা জমিদারসম্প্রদায়ের স্বার্থ আর কেহ বেশী ভাল করিয়া রক্ষা করিতে পারিবেন না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাহা নহে; সেই স্বার্থরক্ষার জন্য আর একটি নূতন সভার আবশ্যক হইয়াছে। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা এই সভার সভাপতি হইবাছেন, সভার নাম আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—ইণ্ডিয়ান্ কন্‌ষ্টিটিয়ুশনাল আসোসিয়েশন। এই সভা সম্বন্ধেও আমাদের মত এই যে, একটি নূতন সভা না করিয়া পুরাতন যেটি ছিল, তাহারই বলবৃদ্ধি করা উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের বোধ হইতেছে যে, এই নূতন সভার অধিষ্ঠানের একটি বিশেষ কারণ আছে। বাঙ্গালার জমীদারদিগের সঙ্গে বেহারের রাজা রাজড়া এবং জমীদারগণ ভাল করিয়া মিলিতে পারেন না, বেহারী-প্রোপাইটরিদ্ধ বাঙ্গালী সাহেব ঘেঁসা', বিশেষ ইলবার্ট বিলের সময় নবীন মহারাজার পশ্চাতে যেরূপ দেল, মিয়ার প্রভৃতি কয়েকজন ইংরাজ একত্র দাঁড়াইয়াছেন, যে তাহাদের উত্তেজনায় নবীন রাজা শিক্ষিত বঙ্গবাসিদিগের সঙ্গে সর্ব্ববিষয়ে একমত হইতে পারেন না। ইলবার্ট বিল্ লইয়াই এই মনান্তর আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালার জমীদারেরা হাজার স্বার্থাপন্ন হইলেও তাঁরা। অন্ততঃ আজকালের বাঙ্গালার সকল সাধারণ মতের উপরেও আপনাদিগের সকল প্রকার মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ করিয়া স্বজাতি-নিন্দক কয়েক জন ইংরাজ কর্ত্তৃক চালিত হইতে সম্মত নহেন। বিশেষ বিদ্যা বুদ্ধি ইত্যাদি ক্ষমতার যখন তাঁহাদের কিছুরই অসদ্ভাব নাই, তখন কেনই বা তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে কয়েক জন ইংরাজের মুখাপেক্ষী হইবেন? বেণ্ট্ বিল্ লইয়া তাঁহারা যে উক্ত ইংরাজদিগের সঙ্গে একবারেই মিলিত হন নাই কিম্বা তাঁহাদের কতক সাহায্যের প্রত্যাশী হন নাই, তাহা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু তথাপি ইহা স্পষ্ট